4

23768

ঈশ্বরের স্বরূপ।

শ্রীকালীচরণ সেন বি, এল্

প্রণীত।

গৌহাটি সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে

সহকারিসম্পাদক শ্রীরামদেব শর্ম্মা কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩২১ সাল



প্রাপ্তিস্থান—

সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দি

গৌহাটি—কামরূপ।



কলিকাতা, ৬০ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট

বণিক প্রেস হইতে

শ্রীশিবপদ ঘোষ বর্ম্মণ দ্বারা মুদ্রিত।



উৎসর্গ।



পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥



স্বর্গত পরমারাধ্য পিতৃদেবের প্রীতি কামনায়
তাঁহার পুণ্যময় পবিত্র নামে
তদীয় অকিঞ্চন তনয়
কর্ত্তৃক
হিন্দুর উপাসনা-তত্ত্ব
ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত
উৎসর্গীকৃত হইল।



নিবেদন।

গৌহাটীর সনাতন ধর্ম্ম সভায় কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া যখন উপাসনা-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তখন আমার আলোচিত বিষয় যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে এরূপ সংকল্প কখনও মনে স্থান দেই নাই। তৎপর সভা হইতে সমাজ সেবক পুস্তকাবলী নামে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পরামর্শ স্থির হওয়ায় আমি কয়েকজন বন্ধুর উৎসাহে ঐ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া উপাসনা-তত্ত্ব প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলাম। হিন্দুর এ দুর্দ্দিনে যদি এই গ্রন্থ পাঠে সমাজের। এক ব্যক্তিরও স্বধর্ম্মে আস্থা হয় তাহা হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই গ্রন্থের কিয়দংশ পুজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত **শশধর** তর্ক চূড়ামণি মহাশয় দেখিয়া দিয়াছিলেন। পরে তদীয় ভাগিনেয় কটন কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম এ বাচস্পতি মহাশয় গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে সংশোধনপূর্ব্বক আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। কটন কলেজের সংস্কৃত সিনিয়ার অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ ও অন্যতর সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় প্রুফসিট সংশোধন করিয়া আমার বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাহাদের নিকট বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার নামক গ্রন্থ এবং শ্রীযুক্ত তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধাবলী হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। স্বধর্ম্ম নিরত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের পৃথিবীর ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড ঈশ্বর পরিচ্ছেদ হইতে কতক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের গীতায় ঈশ্বর বাদ হইতেও কিয়ৎ-পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এজন্য আমি ঐ সকল মহাত্মার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

"হিন্দুর উপাসনা-তত্ত্ব" প্রবন্ধ অতিশয় বিস্তৃত হওয়াতে এবং সমাজ সেবক পুস্তকাবলীর আকার ও মূল্য যথাসম্ভব স্বল্প করিবার প্রস্তাব হওয়ায়, আমি ইহা দুইভাগে বিভক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম ভাগে 'ঈশ্বরের স্বরূপ' বিবৃত হইল। দ্বিতীয় ভাগে 'ঈশ্বরের উপাসনা' বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (কামরূপ) }
১৮৩৪। }

গ্রন্থকার

হিন্দুর উপাসনা-তত্ত্ব।

১ম ভাগ

ঈশ্বরের স্বরূপ।

(১) নির্গুণ ভাব।

আজ কাল শিক্ষিত সমাজে অনেকেই ঈশ্বর-উপাসনা করা আবশ্যক মনে করেন না। তাঁহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণাও যে আছে এমত বোধ হয় না। অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে, এক জন ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু তিনি খোসামোদ প্রিয় নহেন; অতএব তাঁহার উপাসনা করা অনাবশ্যক। তাঁহারা বলেন, এ সংসারে নৈতিক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলেই হইল; ধর্ম্ম ও ঈশ্বর উপাসনা নিয়া সময় ক্ষেপণ করার বিশেষ কোনও প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ইংরাজি শিক্ষিত নহেন তাঁহাদের মধ্যেও যুগ-ধর্ম্মের প্রভাবে অনেকে এই প্রকার উপাসনা সম্বন্ধে উদাসীন। আর্য্যশাস্ত্রের মত যে, ঈশ্বর উপাসনা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাহা না করিলে প্রত্যবায় ঘটিবে। উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্ব্বে আমরা যাঁহার উপাসনা করিব, তাঁহার স্বরূপ কি তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ যাঁহার উপাসনা করিব, তিনি কি বস্তু তাহা না জানিলে তাঁহার ধ্যান ধারণা কিছুই হইতে পারে না; এজন্য ঈশ্বরের স্বরূপ কি তাহা আমাদের সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা আবশ্যক। আর্য্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর সাকার ও সগুণ। তাঁহার আর একটী ভাব বা অবস্থা আছে যাহাকে শাস্ত্রে

নির্গুণ, নিরালম্ব ও নিরুপাধিক বলিয়াছেন। যখন তিনি এই অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁহার কোন ধর্ম্ম কি ক্রিয়া থাকে না; কাজেই এ অবস্থা মানবের মন, বুদ্ধির অগোচর ও উপাস্য নহে। এই নির্গুণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। তৈত্তি ২।৪।১। তাহাকে বাক্য ও মনের দ্বারা প্রকাশ ও ধারণা করা যায় না; তিনি মন, বুদ্ধির অগোচর। তাঁহার এই অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ মানুষের ভাষা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। শাস্ত্র বলিতেছেন, যাঁহারা নির্গুণ ভাব উপলব্ধি করেন তাঁহারা অনন্ত ও অখণ্ড সুখ প্রাপ্ত, তাঁহাদের দ্বৈত ভাব থাকে না; সাধক ও সাধ্য ভাব লোপ হয়। তখন আর কে কাহার উপাসনা করিবে, সাধক কেবল পরম আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকেন।

তদা কেন কংপশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ।—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫। তখন সাধক ও সাধ্য এক হইয়া যায়, কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে জানিবে। রামকৃষ্ণ পরম হংস দেব এক দিন বলিয়াছিলেন;—

"ব্রহ্ম কি তা মুখে বলা যায় না। যার হয় সে খবর দিতে পারে না"। "ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়ে সমাধি হ'লে আর 'আমি' থাকে না। তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না। যেমন নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিলো। একটু নেমেই গলে গেল। 'তদকারকারিত', তখন কে উপরে এসে সংবাদ দেবে সমুদ্র কত গভীর।" এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন "মুকা স্বাদনবৎ" বোবার রস আস্বাদন করার ন্যায়। বোবা যেমন রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হয়, কিন্তু ভাষা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না; তদ্রূপ এই সকল জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ যাঁহারা ঈশ্বরের নির্গুণ ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা ভাষা দ্বারা এ অবস্থা প্রকাশ করিতে পারেন না।

শ্রুতি বলিতেছেন ;—

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাক্ গচ্ছতি ন মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" কেনোপনিষদ্ ১।৩।

যেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্য যাইতে পারে না, মন যাইতে পারে না, বুদ্ধি যাইতে পারে না ; আমরা তাহাকে জানি না ; কিরূপে তাঁহার উপদেশ দেওয়া যাইবে ? তবে এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তিনি এ জগতে জ্ঞাত অজ্ঞাত যত পদার্থ আছে তৎসমুদায় হইতে ভিন্ন।

তুমি যদি বল তিনি তেজোময়, তাহা হইলে হইল না ; কারণ তাঁহার কোন রূপ নাই, তিনি চক্ষুর বিষয় নহেন। যদি বল দয়াময়, প্রেমময় তাহা হইলেও হইল না, কারণ তিনি সমস্ত প্রকার গুণ ও ধর্ম্মের অতীত, তাঁহার কোন গুণ কি ধর্ম্ম নাই। শাস্ত্র জগদম্বার এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ;—

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

কেনোপনিষদ্ ১।৫।

যাহাকে মন দ্বারা ধারণা করা যায় না, কিন্তু মন যাহা হইতে নিজ শক্তি প্রাপ্ত হয় তিনিই ব্রহ্ম ; তিনি উপাস্য নহেন।

যদি উপাসনা করিতে চাও তাহা হইলে ইহা (নির্গুণ ব্রহ্ম-ভাব) উপাসনার বস্তু নহে, "নেদং যদিদমুপাসতে"। স্থানান্তরে বলিয়াছেন এ অবস্থা যে কি, তাহা প্রকাশ করা যায় না। "স এষ নেতি নেতি আত্মা"। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২। এই প্রকার অভাব-বাচক নেতি নেতি শব্দ দ্বারা শাস্ত্র কতকটা আভাস দিয়াছেন মাত্র। তুমি মন ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু ধারণা করিবে ও বলিবে তাহা তিনি নহেন।

মহিম্নঃ স্তোত্রের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—

"অতীতঃ পন্থানং তবচ মহিমা বাঙ্‌মন সয়ো
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিত মভিধত্তে শ্রুতিরপি "

"হে দেব তোমার মহিমা বাক্য ও মনের অগোচর। বেদ ইহা নয়, উহা নয় (নেতি নেতি) এইরূপ অভাব বাচক শব্দ দ্বারা কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

তাঁহার নির্গুণ ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি যে কি, তাহা মানবের বুঝিবার, ধরিবার উপায় নাই। তাঁহাকে যিনি বুঝিয়াছেন বলেন, তিনি তাঁহার এ অবস্থা বুঝিতে ও ধরিতে পারেন নাই। কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত "আমি" অর্থাৎ অহংজ্ঞান থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় না। আমি একটী স্বতন্ত্র বস্তু এই জ্ঞান যখন একেবারে তিরোহিত হয়, আমি ও ব্রহ্ম একই পদার্থ যখন নিশ্চয় জ্ঞান হয়, তখন তাঁহাকে জানা যায়। আমিত্ব না গেলে তাহাকে জানা যায় না, আবার যখন তাঁহাকে জানিতে পারা যায় তখন আমিত্ব থাকে না। তখন আমিত্ব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাত মবিজানতাম্॥ কেন ২।৩

"যিনি ব্রহ্মকে জানেন না, তিনিই জানেন; যিনি জানেন, তিনি জানেন না। ব্রহ্ম যিনি জানেন, তাঁহার অজ্ঞাত, আর যিনি জানেন না, তাহারই জ্ঞাত। কথাটা বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। যে পর্য্যন্ত জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান পৃথক থাকে ততক্ষণ ব্রহ্ম অজ্ঞাত থাকেন; আর যখন সেই ভেদ বুদ্ধি রহিত হইয়া জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান এক হইয়া যায়, তখন ব্রহ্ম জ্ঞাত হয়েন। যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন তিনি ব্রহ্মেই পরিণত হন। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"।

তৈত্তিরীয় ২।১।১। তখন আমি জানিয়াছি এরূপ জ্ঞান থাকে না, নুনের পুতুলের ন্যায় আমিত্ব ব্রহ্ম-সমুদ্রে মিশিয়া যায়।

যেরূপ নদী সকল সমুদ্রে পতিত হইলে নিজ নিজ নাম লোপ পাইয়া সমুদ্রে পরিণত হয়, সেই প্রকার যিনি তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনি পৃথক অস্তিত্বহীন হইয়া সেই পরাৎপর পরম পুরুষের স্বরূপে লীন হন, তখন আর আমি জানিয়াছি এরূপ কে বলিবে।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যম্।"

মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৮

যেমন গঙ্গাদি নদী সকল প্রবাহিত হইতে হইতে নানা প্রকার নাম ও নানাবিধ আকার ধারণ করে, কিন্তু যখন সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া যায়, তখন আর তাহাদের কোনই পৃথক নাম ও আকার থাকে না, সেই প্রকার বিদ্বান ব্যক্তি (আত্মদর্শী ব্যক্তি) অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পরম অক্ষর হইতেও পর দিব্য পুরুষকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জগদম্বা যখন শুদ্ধ এই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ভাবে থাকেন তখন সৃষ্টি স্থিতি কিছুই করেন না। তাঁহার এই ভাব অতি দুর্জ্ঞেয় এবং তাহা বুঝিবার শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের নাই। তাঁহার এই ভাব যখন শ্রুতিও প্রকাশ করিতে পারেন না তখন আমাদের পক্ষে এই নির্গুণ ভাব উপলব্ধি করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

তিনি যতক্ষণ এই প্রকার নির্গুণ ভাবে থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার কোন আকার ও রূপ থাকে না; তিনি তখন সম্পূর্ণ অনির্দ্দেশ্য; তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন; তাঁহার শব্দ নাই, তাঁহার স্পর্শ নাই; তাঁহার রূপ নাই, ক্ষয় নাই। তিনি তখন "অশব্দ মস্পর্শমরূপ মব্যয়ম্"।

(কঠ ৩।১৫)। তিনি তখন অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র অবর্ণ; তাহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই। শঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় ভাষ্যে ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন;—"সর্ব্বকার্য্যধর্ম্মবিলক্ষণে ব্রহ্মনি।" সমস্ত কার্য্য ও ধর্ম্ম হইতে বিপরীত। তাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, "অস্তি" তিনি আছেন; তাহার অতিরিক্ত আর কিছু বলাও যায় না, জানাও যায় না।

"অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।" কঠ ৬। ২

অস্তি—এই মাত্র বলা যায়, তাহার অধিক উপলব্ধি হয় না। শাস্ত্রের মত এই যে, শাস্ত্র কথিত নির্ধর্ম্ম, নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। তবে শাস্ত্র "অধ্যাত্মযোগাধিগম্য" বলিয়া জগদম্বার এই অবস্থাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই অধ্যাত্মযোগ বিষয়টা কি, তাহা বুঝিতে পারিলেই ইহা সুন্দররূপে প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের ন্যায় বিষয়াসক্ত মানবের পক্ষে এই অধ্যাত্মযোগ কথাটা পাগলের প্রলাপবৎ। প্রাচীন ঋষি সমাজেও এই অধ্যাত্মযোগাবলম্বী যোগীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শ্রুতি এই অধ্যাত্মযোগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন;—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" কঠ ৩।১৪

যেমন ক্ষুরের নিশিত ধার দিয়া গমন করা দুঃসাধ্য, পণ্ডিতগণ বলেন, এই অধ্যাত্মযোগের পথও সেইরূপ দুর্গম।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে অধ্যাত্মযোগ এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—"বিষয়েভ্যঃ প্রতি সংহৃত্য চেতসঃ আত্মনি সমাধানম্।" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বাহ্য জগত হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিয়া আত্মায় লীন করার নাম সমাধি যোগ। সেই পরম আত্মাকে পাইতে হইলে ইন্দ্রিয়-

শক্তিকে বিষয় হইতে সংহৃত করিয়া মনে, মনকে বিষয় হইতে সংহৃত করিয়া বুদ্ধিতে; বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতিকে আত্মা বা ব্রহ্মে লীন করিতে হইবে। এই প্রকার যোগ আমাদের ন্যায় কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত মানবের অবলম্বনীয় নহে। যাহারা দিবারাত্র কেবল বিষয় নিয়া ব্যস্ত তাহাদের মুখে শাস্ত্রীয় নিরাকার নির্গুণ উপাসনা অথবা অধ্যাত্মযোগের কথা প্রলাপ মাত্র। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন "তাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা এই মনের দ্বারা জানা যায় না। যে মনে বিষয় বাসনা নেই—সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাহাকে জানা যায়।" অধ্যাত্মযোগ এরূপ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব। শাস্ত্র যেখানে নির্গুণ উপাসনার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানেই এই শাস্ত্রীয় অধ্যাত্মযোগের কথা বলিয়াছেন। সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা এবং এই অধ্যাত্মযোগ আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই অধ্যাত্মযোগাধিগম্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র বলিতেছেন;—

"অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্ যোগেনাত্ম দর্শনম্।"—যাজ্ঞবল্ক্য .।৮

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র মিহ বিদ্যতে।"—গীতা ৪।৩৮

"জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে।"—গৌরপাদকারিকা ১।১৮

সমাধি যোগের দ্বারা অর্থাৎ জীব যখন এই বাহ্য জগত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া এবং হৃদয়ের বাসনা প্রভৃতি সম্যক্ প্রকারে লয় পূর্ব্বক প্রকৃতির পরস্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হন, তখন তাহার আত্মদর্শন হয়। এই আত্মদর্শনই ব্রহ্মজ্ঞান নামে শাস্ত্রে বর্ণিত। আমাদের আত্মা যখন উপাধি (বাসনা প্রভৃতি) শূন্য হয়েন, তখন তিনি ব্রহ্ম। মানব-আত্মা ও পরমাত্মা একই পদার্থ। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই জীবাত্মাই ব্রহ্ম। "নহি জ্ঞানেন সদৃশং" পদে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে তাহা এই আত্মদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান। যখন এই জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন আমি

ও ব্রহ্ম যে পৃথক পদার্থ এরূপ দ্বৈত জ্ঞান থাকে না, জীব শিব হয় এবং জন্মমৃত্যুর হাত এড়াইয়া জীবন্মুক্ত পুরুষ হয়। কাজেই শাস্ত্রীয় নির্গুণ উপাসনা বা অধ্যাত্মযোগ আমাদের ন্যায় বিষয়াসক্ত বাহর্জগতে বিচরণ-শীল মানবের অবলম্বনীয় নহে। এ পথের অধিকারী একালে কেহ আছেন কিনা সন্দেহ, থাকিলেও তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। এই অধ্যাত্মযোগের অধিকারী নির্ব্বাচন করিতে গিয়া বেদান্তসার বলিতেছেন :—

"অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিল-বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্য-নৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্ত-নির্ম্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।" যিনি বিধি পূর্ব্বক (আজ কালকার ধরণে নহে) বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া আপাততঃ অখিল বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, যিনি ইহ জন্মে কিংবা পূর্ব্বজন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জন পূর্ব্বক, সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, পাপস্খালন জন্য প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত ও নিতান্ত নির্ম্মল চিত্ত হইয়াছেন, যিনি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি অধ্যাত্ম যোগের অধিকারী। যিনি ব্রহ্ম নিত্য বস্তু ও অন্য সকল অনিত্য পদার্থ ইহা অসংশয়িত রূপে বুঝিয়াছেন, যিনি ইহ কি পরকালে বিষয় ভোগে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়াছেন, যিনি শম দম ইত্যাদি গুণ সম্পন্ন এবং যাহার বিষয়ানুরাগ সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইয়া মোক্ষ লাভের জন্য একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে, তিনিই শাস্ত্র অনুসারে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তি।

"নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেহামুত্রফলভোগবিরাগশমদমাদি সম্পন্মুমুক্ষুত্বম্"

(বেদান্ত সার)।

এই নির্গুণ উপাসনা বা অধ্যাত্ম যোগের অধিকারী কিরূপ স্থিত-প্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহার লক্ষণ ভগবান্ কৃষ্ণাবতারে গীতায় এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ গীতা ২ অ ৫৫-৫৮।

ভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি, অন্তঃকরণের মধ্যে যত প্রকার আশা তৃষ্ণা বা অভিলাষ আছে, তৎসমস্তই যখন একে কালে পরিত্যাগ করেন, কোন বিষয়েই কোন প্রকার তৃষ্ণা বা কামনা অল্প মাত্রও থাকে না, কেবল মাত্র পরমার্থতত্ত্ব স্বরূপ আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলে। যখন দুঃখেতে কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয়, সুখেতেও কোন প্রকার স্পৃহা না থাকে আর যিনি আসক্তি, ভয় ক্রোধাদি প্রবৃত্তিকে সমূলে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাকে স্থিতধী বা ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি বলা যায়। যিনি ধন, ঐশ্বর্য্য ও পুত্র, কলত্র দেহাদিতে এক কালে নিঃস্নেহ, যিনি শুভ বা অশুভ ঘটনা হইলে কোন প্রকার আনন্দ বা বিদ্বেষ অনুভব না করেন তাহারই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে বলা যায়। কূর্ম্ম যেমন হস্ত পদাদি অঙ্গ গুলিকে বাহির হইতে গুটাইয়া লইয়া দেহের মধ্যে সন্নিবেশিত করে, সেই প্রকার আপন ইন্দ্রিয়গণকে রূপ রসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণ

পূর্ব্বক যিনি আত্মাতে বিলীন করিতে পারেন, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামনির অনুবাদ)।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি॥

গীতা ২য় অ ৭১-৭২।

যিনি সমস্ত প্রকার বাসনা নিঃশেষ রূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশেষে জীবনের উপরেও নিস্পৃহ হইয়া অহং মদীয়ত্ব ভাব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিচরণ করেন তিনি নির্ব্বাণ নামক মুক্তি পাইতে পারেন। হে পার্থ! উক্ত রূপ অবস্থাকে ব্রহ্ম সংস্থান বলে। এই ব্রহ্ম সংস্থান বা ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হইলে জীব পুনর্ব্বার মুগ্ধ হইতে পারে না। জীবনের শেষ দশাতেও যদি এইরূপ ব্রহ্ম নিষ্ঠায় অবস্থিতি করে তাহা হইলেও জীব ব্রহ্মতেই বিলীন হইয়া যায়। (ঐ অনুবাদ)

এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি অধ্যাত্ম যোগের উপযুক্ত পাত্র এবং এইরূপ জ্ঞানই যথা শাস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মনিষ্ঠা। ব্রহ্মজ্ঞান নামক যে অভিনব পদার্থ দেশে আসিয়াছে তাহার সহিত শাস্ত্রীয় ব্রহ্ম জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই।

---

(২) স্বগুণ ভাব।

শাস্ত্রে জগৎপিতা বা জগন্মাতার আর একটী ভাবের কথা বর্ণিত আছে, তাহা ঈশ্বর ভাব। যখন মহা প্রলয়ের অবসানে তাঁহার স্বরূপগত নিত্য ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সগুণ হন, তখন তিনি ঈশ্বরপদবাচ্য হয়েন এবং সাকার ভাব ধারণ করেন। এই ঈশ্বরই আমাদের উপাস্য। আর্য্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর সগুণ ও সাকার। যতক্ষণ তিনি নির্গুণ ভাবে থাকেন ততক্ষণ তিনি ঈশ্বরপদবাচ্য নহেন। যখনি তিনি ঈশ্বর তখনি সাকার; এবং এই সাকার (সগুণ) ভাব পরিগ্রহ করিয়াই তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। ঈশ ধাতু শীলার্থে বরচ্ প্রত্যয় করিয়া ঈশ্বর পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর অর্থে ঈশন শীল পুরুষকে বুঝায়। ইচ্ছা মাত্রই যাঁহার ইপ্সিত সিদ্ধি হইয়া থাকে, তিনিই ঈশ্বর পদবাচ্য। তাহার সামর্থ্যের প্রতিবন্ধক হয় না। তিনি অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী; যিনি ঐশ্বর্য্যশালী তিনি নির্গুণ হইতে পারেন না এবং সগুণ হইলেই তিনি আকারবান্ হইবেন।

পাতঞ্জলদর্শনে সমাধি পাদে ঈশ্বর কাহাকে বলে তাহা এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—

ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

পা ১।২৪ সূত্র

অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চ বিধ ক্লেশ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জাতি, আয়ু ও ভোগ এবং সংস্কার এই সমস্ত যাহাতে নাই এরূপ পুরুষকে ঈশ্বর বলে।

পাতঞ্জল দর্শনের সমাধি পাদের ২২ সূত্র পর্য্যন্ত ঈশ্বর চিন্তা ভিন্ন কি প্রকারে চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া অধ্যাত্ম-যোগের দ্বারা সমাধি

লাভ করিতে পারা যায় তাহা দেখাইয়াছেন। তৎপর ২৩ সূত্রে বলিয়াছেন "ঈশ্বর-প্রনিধানাৎ বা" অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেও সমাধি লাভ হয়। যিনি ভোগে অলিপ্ত এমন পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুরাচার্য্যগণ কুত্রাপি নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলেন নাই। যেখানে তাঁহাকে নিরাকার বলিয়াছেন সেখানেই তাহাকে অজ্ঞেয়, মনোবুদ্ধির অগোচর, নির্গুণ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম চারি প্রকার কারণে রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

(১) স্বভাবের অনুবোধে।

অনন্ত শক্তি সম্পন্ন ভগবানের যখন সৃষ্ট্যাদি সময়ে এক এক শক্তির পরিস্ফুরিত অবস্থা হয়, তখন আপনা হইতেই (অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা ক্রমে) এক এক প্রকার স্ত্রী বা পুরুষাকৃতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। মহাপ্রলয়ে তিনি এক মাত্র অদ্বিতীয় সৎ পদার্থ বিদ্যমান ছিলেন। তখন তাহার নাম, রূপ কিছুই ছিল না, তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবে অবস্থিত ছিলেন।

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। আত্মা বা ইদ মেকাগ্র আসীৎ। শ্রুতি—

প্রলয়ে প্রকৃতি পুরুষ নাম রূপের ভেদ রহিত হইয়া অনির্দ্দেশ্য ভাবে যখন ব্রহ্মে বিলীন থাকে সেই অব্যাকৃত (অপ্রকাশিত) অবস্থায় তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। আদিতে আত্মা (ব্রহ্ম) ভিন্ন আর কিছুই ছিল না কারণ প্রলয়ে সমস্ত জগৎ আত্মায় বা ব্রহ্মে লীন ছিল। সমস্ত জগৎ স্থূল রূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম রূপে ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে (ব্রহ্ম শক্তিতে) বিলীন ছিল এবং প্রকৃতি ব্রহ্মে লীনা ছিলেন; সেই সময়ের বর্ণনা করিতে গিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন;—

নাহোর্ন রাত্রির্নভো ন ভূমিঃ। নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।

তখন দিবা, রাত্রি, আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, জ্যোতি কিছুই ছিল না। সেই সময়ের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা শাস্ত্র বর্ণনা করিতে অক্ষম হইয়া অন্ধকার ও আলোক কিছুই ছিল না এ পর্যন্ত বলিয়াছেন। আলোক ও অন্ধকারের অতিরিক্ত আর কোন পদার্থ আমরা জানি না, কাজেই আমাদের সে অবস্থার ধারণা সাধ্যায়ত্ত নহে। স্থানান্তরে "প্রসুপ্ত মিব সর্ব্বতঃ" যেন সকল জগৎ নিদ্রিতাবস্থায় ছিল এরূপ বলিয়াছেন। মহা প্রলয়ের অবসানে "সো ২ কাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" তাহার যখন আমি বহু হইব এরূপ ইচ্ছা হইল, তখন প্রকৃতিতে ক্ষোভ অর্থাৎ চাঞ্চল্য জন্মিল। এই প্রকৃতি বা ব্রহ্ম শক্তি মহা প্রলয়ের অবসান পর্য্যন্ত সাম্যাবস্থায় অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ব্রহ্মে লীন ছিলেন। যখন প্রকৃতিতে ক্ষোভ জন্মিল, তখন সেই সৎ ব্রহ্ম পদার্থ নিজ শক্তি প্রকৃতিতে (গুণ বা মায়াতে) সংযুক্ত হইয়া ঈশ্বর বা ঈশ্বরী পদ বাচ্য হন এবং নানা প্রকার আকার ধারণ করেন। ব্রহ্মাশ্রিত এই ঐশী শক্তি হইতে জগৎ প্রকাশিত হয়।

সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্ গুণোর্ম্মি সৃষ্টি স্থিতি কাল সংলয়ঃ।
বিষ্ণু পুরাণ ১।১।২।

যিনি প্রকৃতির ক্ষোভ জনিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতুভূত ঈশ্বর তিনিই সৎ অক্ষর ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিজ ঐশী শক্তি প্রকৃতির সাহায্যে যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন তখন তিনি ঈশ্বর।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্। শ্বেত ১।১০।

এই মায়াই প্রকৃতি আর মায়া উপহিত অর্থাৎ মায়া উপাধি যুক্ত পরব্রহ্ম মহেশ্বর নামে অভিহিত হন। ব্রহ্ম মায়োপাধি গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর হয়েন ইহাই আর্য্য শাস্ত্রের মর্ম্ম। এই মায়া ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তি, বেদান্ত শাস্ত্রে এই শক্তিকে ঈক্ষণ শক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন,

এই ঈক্ষণ শক্তি ব্রহ্মের নিত্য শক্তি, ইহা ব্রহ্মে কখন অভাব ছিল না। তবে এই শক্তি কখন প্রকট (প্রকাশ) কখন অপ্রকট (অপ্রকাশ) ভাবে থাকে।

আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরণ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্।

ভাগবত ৪।৭।৪৮

হে ব্রহ্মন্ আমি গুণময়ী নিজ মায়াকে আশ্রয় করিয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কার্য্য নিষ্পন্ন করি তদনুসারে আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র বিভিন্ন সংজ্ঞা হয়। ব্রহ্মের এই ইচ্ছা শক্তি দ্বারা জগদাদি আবির্ভূত হইতেছে, এই শক্তিকেই আশ্রয় করিয়া জগৎ অবস্থিতি করে এবং ইহাতেই জগতের লয় হয়। জগতের অন্য কোন উপাদান নাই, তিনি যতক্ষণ এই শক্তি যুক্ত (অর্থাৎ শক্তির প্রকাশাবস্থাপন্ন) ততক্ষণ তিনি প্রকট ও জ্ঞেয়। শক্তি তন্মধ্যে বিলীনা হইলে তিনি অজ্ঞেয় ভাব ধারণ করেন—তখন তিনি নির্গুণ। এই প্রকার সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং তৎসহ ব্রহ্মের প্রকট ও অপ্রকট অবস্থা অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। শক্তির স্ফুরণ হইলে, রূপেরও স্ফুরণ হইয়া থাকে। এই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম একই বস্তু; সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ কেবল ভাবের প্রভেদ মাত্র। ব্রহ্মের এই দ্বিরূপত্ব সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদিত। তিনি একদিকে গুণাতীত, অপর দিকে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বাশ্রয়। নির্ব্বিশেষ নির্গুণ পরব্রহ্ম যখন মায়া উপাধি অঙ্গীকার করিয়া নিজকে যেন সঙ্কুচিত করেন তখন তাহার যে সগুণ ভাব হয় তাহাই ঈশ্বর ভাব। যেমন ঊর্ণনাভ জাল রচনা করিয়া নিজকে আবৃত করে, সেইরূপ স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রধানজ (প্রকৃতিজ) জালে আপনাকে আবৃত করিয়া সগুণ অর্থাৎ ঈশ্বর ভাব ধারণ করেন।

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ।

স্বভাবতো দেব এক স্বমাবৃণোৎ॥ শ্বেতাশ্বতর ৬।১০

অনন্ত সাগরের যে নিবাত প্রশান্ত অবস্থা তাহাই ব্রহ্মের নির্গুণভাব আর সমুদ্রের যে বীচি বিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত অবস্থা তাহাই ব্রহ্মের সগুণভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত কখন বিক্ষুব্ধ; একই ব্রহ্ম কখন নির্গুণ কখন সগুণ। প্রশান্ত সমুদ্র কখন বিক্ষুব্ধ হইতেছে আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্তভাব ধারণ করিতেছে। পরব্রহ্ম মায়া আবরণে সগুণ হইতেছেন আবার মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নির্গুণ নিস্তরঙ্গ হইতেছেন। পর্য্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রের ঐ দুই অবস্থা, পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্মেরও ঐ দুই বিভাব। বেদ একবার যাঁহাকে "অপাণি পাদ" বলিয়াছেন তাহাকেই আবার "সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই জন্য শাস্ত্র তাঁহাকে অবস্থাভেদে শবের ন্যায় নিষ্ক্রিয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শক্তিহীনঃ শবঃ প্রোক্তঃ শক্তিযুক্তঃ সদাশিবঃ।

তিনি যখন নিজ শক্তিকে আশ্রয় করেন না তখন তিনি শব তুল্য নিষ্ক্রিয়, আর যখন নিজ শক্তিকে আশ্রয় করেন তখন তিনি সদাশিব অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। এই অবস্থায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা "সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা"। অবশ্য শক্তিহীন অবস্থায় তাঁহাকে যে শব বলিয়াছেন এ দৃষ্টান্ত সম্যক্ প্রকারে প্রযুজ্য নহে কারণ শবের রূপ ও আকার থাকে কিন্তু সে সময় তাঁহার কোন রূপ কি আকার থাকে না। তাঁহার ক্রিয়া হীন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শব বলিয়াছেন ইহাই বুঝিতে হইবে।

ভগবতী গীতায় বলিয়াছেন—

স্রষ্টার্থ মাত্মনো রূপং ময়ৈব মেচ্ছয়া পিতঃ।

কৃতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ স্ত্রী পুমানিতি ভেদতঃ॥

পিতঃ পর্ব্বত রাজ, আমি সৃষ্টির জন্য নিজ রূপকে সেচ্ছাক্রমে স্ত্রী পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি।

সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্।
সংহরামি মহারুদ্র রূপেণান্তে নিজেচ্ছয়া॥

ভগবতীগীতা ৪র্থ অঃ ১৫ শ্লোক।

আমি ব্রহ্মরূপে এই চরাচর জগৎ সৃজন করি। আবার অন্ত কালে স্বেচ্ছাক্রমেই মহারুদ্র রূপে জগৎ সংহার করি।

নির্গুণং সগুণশ্চেতি দ্বিধা মদ্রূপ মুচ্যতে।
নির্গুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতং॥

নির্গুণ ও সগুণ ভেদে আমার দুই প্রকার রূপ। তিনি মায়া অর্থাৎ গুণযুক্ত হইয়া আকারবান্ হন। মানুষের যেমন দুই অংশ—দেহাংশ ও আত্মাংশ—তাঁহারও সেইরূপ। তাঁহার আত্মাংশ নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ ইহা উপাস্য নহে, ইহাই শাস্ত্রীয় ব্রহ্ম। দেহাংশ ও আত্মাংশ লইয়া ঈশ্বর; ইনি সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করেন এবং আকারবান্ ও গুণসম্পন্ন। এই ঈশ্বরই আমাদের লক্ষ্য। তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। বেদান্ত দর্শনে তাঁহার নিমিত্ত কারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" যাহা হইতে জগতের আবির্ভাব হইয়াছে এবং "যোনিশ্চ হি গীয়তে" (১অঃ ৪র্থ পাদ ২৭ সূত্র) "প্রকৃতিশ্চ" (১অঃ ৪র্থ পাদ ২৩ সূত্র) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা তিনি যে জগতের নিমিত্ত কারণও বটেন তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতি আর পুরুষ বা শক্তি আর চৈতন্য এই উভয়ের স্বরূপ। এই উভয় মিলিয়াই ঈশ্বর; তন্মধ্যে প্রকৃতি শক্তি) তাঁহার দেহ এবং পুরুষ (চৈতন্য) তাঁহার আত্মা। প্রলয়াবসানে সৃষ্টি কার্য্যের জন্য নানা প্রকার রূপ পরিগ্রহ করেন যথা;— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী ইত্যাদি। ইঁহারা সেই

প্রকৃত্যাত্মক পরম পুরুষের ইচ্ছাময় অবতার। সৃষ্টির অবসানে মহা প্রলয়ে এই সকল রূপের অভাব হইয়া থাকে; কিন্তু নষ্ট হয় না। কারণ এই গুলি নিত্য; কেবল মহাপ্রলয়ে প্রকাশের অভাবে ব্রহ্ম সত্ত্বায় লীন থাকে এবং সৃষ্টি সময়ে প্রকাশমান হয়। তিনি দেহধারী হইলেও তাঁহাতে জীব ভাবের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। তাঁহার দেহের সহিত ভূত বা ভৌতিক পদার্থের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই; অস্থি, মজ্জা, রক্ত প্রভৃতি কিছুই নাই, অথচ মনুষ্যাদির ন্যায় হস্ত পদ বিশিষ্ট। তাঁহার এই সকল দেহ শক্তিময় ও ইচ্ছাময়; প্রয়োজন শেষ হইলে তাহাদের তিরোধান হয়। ইহাদিগকে নিয়ত আবির্ভাব বলে কারণ ইহাদের আবির্ভাবের ও তিরোধানের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত এই সকল ইচ্ছাময় রূপ প্রকট অবস্থায় থাকে। ভারতবর্ষের আর্য্যঋষিগণ শ্রুতি প্রদর্শিত সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়া এই সকল সত্য অবগত হইয়াছিলেন।

(২) জগতে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য।

মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভাদি দৈত্য দানব বিনাশ পূর্ব্বক জগতের শান্তি স্থাপন করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য সময় সময় তাঁহার ইচ্ছাময় রূপের আবির্ভাব হয়। ইহাদিগকে অনিয়ত আবির্ভাব বলে, কারণ ইহাদের আবির্ভাবের সময় নির্দ্দিষ্ট নাই, প্রয়োজন হইলেই আবির্ভূত হয় এবং কার্য্য শেষ হইলে তিরোহিত হয়।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততং।
তথাপি তৎ সমুপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্য সিদ্ধ্যর্থ মাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥ (চণ্ডী)

মেধস ঋষি বলিতেছেন;—"তিনি নিত্যা অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার দ্বারা এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। যদিও

তাঁহার আমাদের ন্যায় উৎপত্ত্যাদি কিছুই নাই, তথাপি লোকে তাঁহার এক প্রকার উৎপত্ত্যাদি কীর্ত্তন করে, তাহা তুমি আমার নিকট বহু প্রকারে শ্রবণ কর। তোমার স্মরণার্থে পুনরপি বলিতেছি, তিনি নিত্য বস্তু কিন্তু দেবগণের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত যখন আবির্ভূত হন, তখনই লোকে তাঁহাকে উৎপন্না বলিয়া থাকে।" (৺প্রসন্ন কুমার শাস্ত্রি-কৃত অনুবাদ)

গীতাতেও ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

যে সময় ধর্ম্মের ক্ষয় ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়া আইসে তখনই আমি (মায়াকে অবলম্বন করিয়া) জন্ম গ্রহণ করি।

জগতের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ভগবান্ যে সকল রূপ পরিগ্রহ করেন, তাহারা সকলেই অনিয়ত আবির্ভাবের অন্তর্গত ; প্রভেদ এই কতকগুলি রূপের বাল্য কৌমারাদি অবস্থা আছে এবং কতকগুলি রূপের কৌমারাদি অবস্থা নাই। প্রথমোক্ত অনিয়ত আবির্ভাবের দৃষ্টান্ত সতী, বামন, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি এবং শেষোক্ত প্রকারের উদাহরণ কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, তারা, নৃসিংহ, ত্রিপুরারি ইত্যাদি। ইহাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের উপকার সাধনের নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্য এই সকল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন।

(৩) উপাসকগণের উপাসনার নিমিত্ত।

শাস্ত্র বলিতেছেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিস্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

চিন্ময় অদ্বিতীয় (যাঁহার দ্বিতীয় নাই) কলাশূন্য অশরীরী ব্রহ্ম উপাসকগণের উপাসনা সৌকর্য্যের জন্য শরীর পরিগ্রহ করেন।

ভগবতী-গীতায় জগন্মাতা হিমালয়কে বলিয়াছেন—

অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব।
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ।
তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ॥

আমার স্থূলরূপের সম্যক্ ধ্যান না করিয়া কেহ আমার সেই সূক্ষ্ম রূপে প্রবেশ করিতে পারে না, যে সূক্ষ্মরূপ দর্শন করিলে জীব সংসার বন্ধন বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করে। সেই হেতু মুক্তি অভিলাষী সাধক অবশ্য আমার স্থূল রূপ আশ্রয় করিবে।

স্থূল সূক্ষ্ম উভয় রূপই তাঁহার। উদ্ধৃতবাক্যে সূক্ষ্ম রূপ দ্বারা ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; এ রূপ মানবের মনোবুদ্ধির অগম্য, এজন্য তাঁহার স্থূল রূপ অর্থাৎ ঈশ্বর রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এ সকল রূপ যে তাঁহার নিজের, মানুষের কল্পিত নহে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে আছে। "ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা" অর্থে মানুষের মিথ্যা কল্পনা নহে, এখানে "ব্রহ্মণঃ" পদে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হইয়াছে, কল্পনা অর্থে সৃজন; এই সৃষ্টি তাঁহার নিজের, তিনি নিজে নিজের রূপ সৃজন করিয়াছেন। অন্যত্রও এই অর্থে কল্পনা শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" বিধাতা পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ সেই রূপ সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন। বেদান্ত দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ত্রিংশ সূত্রে আছে "অভিব্যক্তে রিত্যাশ্মরথ্যঃ।"

এই সূত্রে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, অশ্মরথ্য মুনি বলেন অনন্যমতি উপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত পরমাত্মা অনন্ত হইলেও বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়েন।

পরের সূত্রেও আছে "অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ"—বাদরি মুনি বলেন অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যানের নিমিত্ত পরমেশ্বরকে কখন প্রাদেশ পরিমাণ, কখন

শিরশ্চরণাদি অবয়ববিশিষ্টরূপে আদেশ করিয়াছেন (শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী কৃত ভাষ্যের অনুবাদ)

শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতি যাবতীয় আর্য্য শাস্ত্রে উপাসকগণের হিতার্থে তাঁহার রূপ পরিগ্রহের কথা আছে। এই সকল মূর্ত্তি মানুষের কল্পিত, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক কথা।

(৪) তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ ব্যঞ্জনার নিমিত্ত।

তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নিজে ব্যক্ত না করিলে মানুষের কি সাধ্য আছে যে তাহা উপলব্ধি করে। তাঁহার এক একটী রূপের দ্বারা এক একটী অতি দুর্জ্ঞেয় অবস্থার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল আকৃতি দেখিলেই তাহার সেই দুর্জ্ঞেয় অবস্থাটিরও এক একটী সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। প্রত্যেক মূর্ত্তি দ্বারা নানা প্রকার ভাব ও শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ব রজঃ তমোগুণ বা শক্তি দ্বারা তিনি ব্রহ্মাণ্ডে নানা প্রাকার লীলা খেলা করিতেছেন। কোন মূর্ত্তিতে একটী, কোন মূর্ত্তিতে দুইটী, কোন মূর্ত্তিতে তিনটী গুণের প্রকাশ পাইতেছে, অথচ প্রত্যেক মূর্ত্তিতে ত্রিগুণেরই সমাবেশ আছে। এই সকল গুণ অবলম্বন করিয়া তিনি অনন্ত লীলা করিতেছেন এবং প্রকৃতি সম্ভূত পিতৃ মাতৃ শক্তির সনাতন লীলার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিত্যাদি যাবৎ কার্য্য সংসাধিত করিতেছেন। তিনি একাই নিজশক্তি প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব শক্তি রূপে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এই সকল রহস্য কোন মূর্ত্তিতে একাধারে অর্দ্ধনারীশ্বর, হরগৌরী ইত্যাদি রূপে এবং কোন মূর্ত্তিতে পৃথকভাবে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, কালী, শিব ইত্যাদি রূপে দেখাইতেছেন।

আজকাল যে ঘোর অবিশ্বাসের কাল পড়িয়াছে তাহাতে এই সকল মূর্ত্তি যে সত্য সে বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইয়া থাকে। লোকে এখন

আর পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিধাশূন্য হইয়া কেবল শাস্ত্র বাক্য বিশ্বাস করিতে চাহে না। বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে কেহ কিছু মানে না। এজন্য ঈশ্বরের যে সকল রূপ পরিগ্রহের কথা বলা হইল তাহাব সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন প্রমাণ আছে কিনা এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আর্য্য শাস্ত্রে এই সকল রূপের কথা সর্ব্বত্রই বর্ণিত আছে। পুরাচার্য্য ঋষিগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যাহা প্রতিভাত হইয়াছিল তাহাই তাঁহারা শাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন; মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া লোক সমাজকে প্রতাবণা করার কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা জ্ঞান বলে অন্তর রাজ্যের সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহারাই ঋষি।

অনেকের বিশ্বাস আজ কাল যে সকল দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রচলিত আছে তাহাব কোনও প্রসঙ্গ বেদে নাই। নিম্নে কয়েকটী মাত্র উদ্ধৃত করা গেল তদ্দ্বারা এই মতের অসারতা প্রতিপাদিত হইবে।

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষুজুষ্টাং
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।
কালরাত্রীং ব্রহ্মস্তুতাং বৈষ্ণবীং স্কন্দমাতরং।
সরস্বতী মদিতিং দক্ষ দুহিতরং নমামঃ পাবনাং শিবাং।

(ঋক্ সং)

যাহার অঙ্গের বর্ণ অগ্নির ন্যায় সুগাঢ় পীত, যিনি সর্ব্বজ্ঞতা প্রতিভায় সর্ব্বদা প্রদ্যোতিতা যিনি যথাযথ ফল লাভের জন্য দানবগণ কর্ত্তৃক উপাসিতা, আমি এই দুস্তর ভব সাগর সন্তরণের নিমিত্ত সেই দুর্গা দেবীর শরণ লইলাম। যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন, যিনি সমস্ত বেদের প্রতি পাদ্য অথবা ব্রহ্মার আরাধ্যা, যিনি বৈষ্ণবী রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি ষড়াননের জননী রূপে মহেশ গেহিনী, যিনি সরস্বতী

রূপে ব্রহ্মার পত্নী, যিনি অদিতি রূপে কশ্যপের পত্নী হইয়া বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য ও অন্যান্য ইন্দ্রাদি দেব বৃন্দের জননী; সেই সর্ব্বপাবন পাবনা দক্ষ-দুহিতা দুর্গা দেবীকে নমস্কার। (পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যা)

অথ হৈনাং পরব্রহ্ম রূপিনীং ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ো ভবতি।
অব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ভবতি। অশ্রোত্রিয়ো শ্রোত্রিয়ো ভবতি।
স সর্ব্বস্মাৎ পাপ্মনা বিমুক্তো ভবতি, বিমুচ্যতে এতদ্বৈতৎ।
(অথর্ব্ববেদ সং)

যিনি বহু জন্মের উপার্জিত ভাগ্য বলে এই পরম ব্রহ্ম রূপিণী দক্ষিণাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে অনুভব করিতে পারেন তিনি ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন, সুতরাং তিনি অব্রাহ্মণ হইলেও তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। অশ্রোত্রিয় হইলেও তিনি সমস্ত বেদার্থের পারদর্শী এবং নিখিল পাপ রাশি হইতে বিমুক্ত হয়েন। কেবল ইহাই নহে, তিনি ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (ঐ ব্যাখ্যা)

"উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূত যোনিং সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥"
(কৈবল্যোপনিষৎ)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যের পরমেশ্বর সমস্ত লোকের সাক্ষি স্বরূপ জড়াতীত সর্ব্বভূতের নিদান নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন দেবকে উমার সহিত ধ্যান করিয়া মুনিগণ ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব।
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা॥ (মুণ্ডক ১।১)

দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন তিনি বিশ্বের কর্ত্তা ও ভুবনের রক্ষা কর্ত্তা।

হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং (শ্বেত ৩।৪)

তিনি হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) রূপে প্রথমতঃ প্রকাশিত হন। জনয়ামাস শব্দে উৎপন্ন করান অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম পদার্থ ব্রহ্মারূপে প্রতিভাত হন। যে উপনিষদের দোহাই দিয়া নিরাকার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইতেছে সেখানেও তাহার রূপের কথা আছে। উপরে যে কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করা গেল তদ্বারা ইহা উত্তমরূপে প্রমাণিত হইবে। বাহুল্য বোধে আর বেশী উদ্ধৃত করিলাম না; পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্র হইতে অনাবশ্যক বোধে কোনও প্রমান উদ্ধৃত করা হইল না; কারণ সকলেই জানেন ঐ সকল শাস্ত্রে আকারবান্ সগুণ ব্রহ্মের কথা বহুল ভাবে বিবৃত আছে।

এখন সাধক সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যে আমরা কি জানিতে পারি তাহা দেখা যাউক। আজ বেশীদিনের কথা নহে প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইল ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মেহারে ৺ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর এক রাত্রে জগদম্বার দশ মহাবিদ্যারূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নিরক্ষর মূর্খ ছিলেন, রূপ দর্শন মাত্র তাহার মুখ হইতে সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল। সেই স্তোত্র আজিও সাধক সমাজে প্রচলিত আছে; তাঁহার জীবনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"অনন্তর সেই নিশীথ সময়ে সহসা তাঁহার হৃদয়-পদ্ম হইতে চন্দ্র ও সূর্য্য সদৃশ নির্ম্মল ও তেজোময় এক অগ্নিপিণ্ডাকৃতি পদার্থ নিঃসৃত হইয়া সমুদয় বন ব্যাপ্ত হইল। ঐ তেজোময় অগ্নি পিণ্ডাকৃতি পদার্থ ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিলে তাহাতে তিনি সুনির্ম্মল ইষ্টদেবীর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন। অনন্তর পুনঃ পুনঃ তাহা অবলোকন করিতে করিতে স্বীয় ইষ্টদেবীর প্রকৃত অবয়ব সমুদয় তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইলে তিনি আনন্দ চিত্তে তাঁহার ধ্যান চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই মূর্ত্তিমতী দেবী বর্ণনাতীত মনোহর রূপ বিশিষ্টা, ভক্তবৎসলা, ঈষৎ হাস্যানন যুক্তা, পদ্ম

সদৃশ স্বচ্ছ মুখবিশিষ্টা, নীলপদ্ম সদৃশ সুন্দর নেত্রযুক্তা, সতত দয়াদ্র হৃদয়বিশিষ্টা, সাধকগণের অভীষ্ট বরপ্রদায়িনী, ভক্তদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, শান্তদিগের শান্তিদায়িনী, জবাপুষ্পের ন্যায় সুন্দর আভাযুক্তা, কোটিচন্দ্রকিরণের ন্যায় শীতল জ্যোতিঃপূর্ণা, পদ্মসদৃশ মুখযুক্তা, পদ্মসদৃশ কোমলহস্তবিশিষ্টা, চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল চক্ষুর্জ্যোতিঃসম্পন্না, ত্রিলোকজননী, নিত্যা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষপ্রদায়িনী এবং সদা আনন্দপ্রদায়িনী; সেই দেবী সর্ব্বানন্দকে বলিলেন।" (সর্ব্ববিদ্যাবংশীয় শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ের কৃত সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ।)

এই সর্ব্বানন্দ ঠাকুর সিদ্ধাবস্থায় সর্ব্ববিদ্যা নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আজিও তাঁহার বংশধরগণ ত্রিপুরা জিলার মেহার ও যশোহর জিলার বেন্দা ঘাটভোগ প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমান আছেন।

সাধক প্রবর হালি সহর নিবাসী রামপ্রসাদ সেনের নাম বঙ্গদেশে অল্প বিস্তর সকলেই অবগত আছেন। তিনি কালীরূপের সাধক ছিলেন; সময় সময় তিনি যে ইষ্টদেবীর রূপ প্রত্যক্ষ করিতেন তাহা তাঁহার রচিত সঙ্গীতেই প্রকাশ। দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী পাঠে তিনি যে তাঁহার ইষ্টদেবতার রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—

"যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী (আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাহাকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই সব কাজ করেন তখন তাহাকে শক্তি ব'লে কই।"

"তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ নির্গুণ বল্‌বার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মান্‌তে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ পুরাণ তন্ত্রে আদ্যাশক্তি বা কালী বলে গেছে।"

"তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহ ধারণ করে আসেন এও সত্য; নানরূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন এও সত্য। বেদে তাকে সাকার নিরাকার দুই বলেছে, সগুণও বলেছে নির্গুণও বলেছে।"

" যারা নিরাকার নিরাকার ক'রে তারা কিছু পায় না। তাদের না আছে বাহিরে না আছে ভিতরে।"

মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত পাঠে জানা যায় যে, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরের রূপ দেখাইয়া ছিলেন। অচিরস্বর্গত নিবারণচন্দ্র দাস মহাশয়ের লিখিত জীবনী হইতে নিম্নে কতক অংশ উদ্ধৃত করা গেল—

"স্বামীজীর উপদেশের পর উমাচরণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্য সত্যই কি ঈশ্বরকে দর্শন পাওয়া যায়? স্বামীজী বলিলেন, সাধনা করিলে ও গুরুর কৃপা হইলেই পাওয়া যায়। তুমি কি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও? উমাচরণ বাবু অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন, প্রভো তাহা হইলে কৃতার্থ হই। স্বামীজী বলিলেন, আমার আসনের নিকট যে কালী মূর্ত্তি আছে তাহাকে দেখিয়া আইস। উমাচরণ বাবু দেখিলেন যে পাষাণময়ী মা অচলা বিরাজমানা; আসিয়া বলিলেন, দর্শন করিলাম। স্বামীজী বলিলেন, তাহাকে কি এইখানে দেখিতে চাও? উমাচরণ বাবু বলিলেন তাহা হইলে কৃতার্থ হই। স্বামীজী ধ্যানস্থ হইয়া মাকে ডাকিলেন; উমাচরণ বাবু প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে একটী কুমারী বালিকার ন্যায় সেই পাষাণময়ী মা ধীরপদবিক্ষেপে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অস্পষ্ট দীপালোকে চৈতন্যময়ীর গতি দর্শনে উমাচরণ বাবু অতিশয় ভীত ও চমৎকৃত হইলেন। স্বামীজী উমাচরণ বাবুকে বলিলেন, যাও পুনর্ব্বার দেখিয়া এস মার মূর্ত্তি সেখানে আছে কিনা। উমাচরণ বাবু কম্পিত পদে ভয়বিকলচিত্তে গেলেন বটে কিন্তু মায়ের

মূর্ত্তি আর সেখানে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার আরও ভয় হইল; দৌড়িয়া স্বামীজীর নিকট আসিলেন। স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন ও মাকে নিজের আসনে যাইতে সঙ্কেত করিলেন। ছোট মেয়েটীর মত মা আবার ধীর পদ সঞ্চারে নিজ আসনে পাষাণময়ী হইয়া বিরাজমানা রহিলেন।"

নবদ্বীপের শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব তাঁহার নিজের লীলায় ব্রহ্মের সাকার সগুণ রূপের কথা নানা ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। গৌরাঙ্গ দেবকে সম্প্রদায় বিশেষে অবতার স্বীকার করেন না কিন্তু তিনি যে পরম ভগবদ্ভক্ত ছিলেন সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। ভক্ত ও ভগবানে কোন প্রভেদ নাই কারণ ভক্তের যখন সোঽহং জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত হয় তখন তিনি ঈশ্বরপদবাচ্য হয়েন; সে অবস্থায় তাঁহাতে ও ঈশ্বরে কোন পার্থক্য থাকে না, তিনি অনন্ত সত্ত্বায় মিলিত হইয়া যান। এ ভাবে দেখিলেও শ্রীচৈতন্য দেব যে ঈশ্বর বা ঈশ্বরতুল্য মহাপুরুষ ছিলেন তৎপ্রতি সন্দেহ করার কোন কারণ দেখা যায় না। তিনি প্রেম ভক্তি প্রচার করিয়া রাধাকৃষ্ণের গুহ্য সাধন রহস্যগুলি নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন।

এই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতে এরূপ সাধকের সংখ্যা খুব বেশী না থাকিলেও তাহাদের একেবারে অসদ্ভাব হয় নাই। যাঁহার অন্তরে প্রকৃত পিপাসা জন্মিয়াছে তিনি এখনও মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পান। মহাত্মা ৺বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী জীবনের প্রথম ভাগে অন্যমতাবলম্বী হইয়াও শেষ ভাগে ঐ মত পরিহার পূর্ব্বক ৺পুরী ধামে সাকার ঈশ্বরের (কৃষ্ণ রূপের) সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শাস্ত্র বাক্য ও সাধকের সাক্ষ্য ছাড়াও আর একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। সাধন

পথে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট উপায়ে অগ্রসর হইলে নিজ নিজ জীবনে সাকার রূপের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, ইহা শাস্ত্রের উপদেশ। ইহা অপেক্ষা আর কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে?

ঈশ্বরের রূপ পরিগ্রহ সম্বন্ধে আর একটী আপত্তি শুনা যায়। অনেকে এরূপ বলেন যে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যখন ইচ্ছা মাত্রই সকল কার্য্য সংসাধিত করিতে পারেন, তখন কোন অসুর কি দৈত্য দানব কি রাক্ষস বধের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া পৃথিবীতে রামকৃষ্ণাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করার কারণ কি ছিল? এই সকল অবতার অবিশ্বাস করিবার পক্ষে তাঁহারা ইহা একটী অকাট্য যুক্তি মনে করেন। মহিষাসুর বধের জন্য দুর্গা দেবীর আবির্ভাব ও শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধে আদ্যাশক্তি কালীর আবির্ভাবও তাঁহারা উল্লিখিত যুক্তিমূলে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা এই তর্ক উপস্থিত করেন তাহাদের গোড়ায় একটু ভুল আছে। তাঁহারা মুখে বলেন সর্ব্বশক্তিমান্ কিন্তু এ দিকে মনে করেন ভগবানের অবস্থাও ঠিক আমাদেরই মত। আমাদের যাহাতে কষ্ট হয় তাঁহারও তাহাতে কষ্ট হইবে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ঐ রূপ আপত্তি উত্থাপন করেন। যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে থাকিয়া সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিতেছেন, তাঁহার কষ্ট আমাদের দৃষ্টান্তে বুঝিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। যিনি কালের কাল, তোমার আমার লক্ষ বৎসর যাঁহার নিমেষ মাত্র, তিনি লীলার জন্য মর্ত্ত্য ধামে কিছু কাল মানব শরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করিলে তাঁহার কষ্ট হইবে ইহা মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তবে একথা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে রাম কৃষ্ণ দুর্গা কালী রূপে অবতীর্ণ না হইয়া অন্য উপায়ে এই সকল কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিতেন। সংসারে কি উদ্দেশ্যে কি করিতেছেন, কেন মানুষকে মানুষ করিলেন, গাছকে গাছ করিলেন, এ সকল কথার উত্তর কে

দিবে? আমরাত কোন "কেনরই" উত্তর দিতে পারি না তবে এই সকল রূপ পরিগ্রহ করিয়া "কেন" মর্ত্তধামে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার কারণ খুজিতে যাই কেন? কি উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিতেছেন তাহা তিনি ভিন্ন কে বলিবে? কাজেই এ প্রতিকূল যুক্তি অতি অসার ও অগ্রাহ্য। আমাদের নিজের ওজনে তাঁহাকে বুঝিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার কোন্ কার্য্যটা বুঝিতেছি? আর তুমি আমি তাঁহার অনন্ত লীলা খেলা কি বুঝিব? তিনি জগতকে নিয়া অনাদি কাল হইতেই ধূলা খেলা করিতেছেন।

মন্বন্তরাণ্যসঙ্খ্যানি সর্গঃ সংহার এবচ।
ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ।

তিনি অসংখ্য মন্বন্তর ও বার বার সৃষ্টি সংহার খেলার ন্যায় করিতেছেন।

———

মানুষের ঈশ্বর জ্ঞান সাকার।

আমরা ইতি পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে শাস্ত্র কথিত নির্গুণ, নিরুপাধিক, নিরাকার ব্রহ্ম অজ্ঞেয় ও মানবের জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর ও উপাসনার অতীত। শাস্ত্র যেখানে ঈশ্বরের কথা বলিয়াছেন সেখানেই আকারবান্ গুণযুক্ত পুরুষের কথা। আকার ভিন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। এখন দেখা যাউক আকার ভিন্ন অন্য কিছু চিন্তা করা সাধ্যায়ত্ত কিনা? আর্য্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে মন সাকার।

এতে পুনরাকাশাদিগতসাত্ত্বিকাংশেভ্যো
মিলিতেভ্য উৎপদ্যেতে—(বেদান্ত সার)।

ইহা দুইটী (মন ও বুদ্ধি) আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও পৃথিবী এই সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন।

হিন্দু দর্শন শাস্ত্র অনুসারে মন সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতে গঠিত একটী জড় ইন্দ্রিয়; ইহা চৈতন্যের সাহায্যে কার্য্যক্ষম হয়। আকারবাদ দিয়া নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা আকারহীন কোন কিছু চিন্তা করিবার ক্ষমতা মনের নাই। মন সাকার; মন যাহা কিছু চিন্তা করিবে সমস্তই সাকার। আমি যাহা কিছু চিন্তা করি, ধারণা করি সমস্তই জড়ের সাহায্যে; জড়ের সাহায্য ভিন্ন আমরা কিছুই ভাবিতে পারি না। আত্মা (চৈতন্য) ভিন্ন এই ব্রহ্মাণ্ডে আর যাহা কিছু আছে সমস্তই জড়। শুদ্ধ আত্মা বা চৈতন্যকে আমরা চিন্তা করিতে পারি না; জড়ের সাহায্যে চৈতন্যকে চিন্তা করিয়া থাকি মাত্র। জড়ের বিমিশ্রণ ছাড়া শুদ্ধ খাটি নিরুপাধিক চৈতন্য যে কি পদার্থ তাহা আমরা

বুঝিতে ও ধরিতে পারি না। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি দয়াময়, প্রেমময়, মঙ্গলময়, বিরাট্, বিভু, জ্যোতিম্ময় ইত্যাদি বাক্যাবলি প্রয়োগ করিয়া সাকারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারাও সাকার রূপই চিন্তা করেন। এই সকল বৃত্তি ও চিন্তা সাকার জ্ঞান মূলক। দয়াময়, প্রেমময়, মঙ্গলময় বলিলে যাঁহাকে দয়াময়, প্রেমময় ও মঙ্গলময় বলিব তাঁহার একটা চিত্র মনের মধ্যে উদিত হইবেই হইবে। দয়াময় মঙ্গলময় বলিব, অথচ কোন আধাব থাকিবে না ইহা অসম্ভব। দয়াময় বলিলে যাহাতে দয়া আছে তাহার একটা চিত্র কি মনে আসিবে না? আধাবের সঙ্গে সঙ্গে দয়াময়, প্রেমময়, মঙ্গলময় কার্য্যের চিত্রগুলি মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হইবে। অভ্যাস বশত সেই চিত্রগুলির স্ফুরণ অতি তাড়াতাড়ি হওয়ায় একটু নিপুণ ভাবে চিন্তা না করিলে ধরিতে পারা যায় না। একটু প্রণিধান করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে আমরা সাকার চিন্তা করিতেছি আর আধারের চিত্র অর্থাৎ যাঁহাকে দয়াময় ইত্যাদি বলিতেছি তাহার একটা চিত্র দয়াময় ইত্যাদি বলা মাত্র যুগপৎ মানস পটে উদিত হইতেছে। গোঁড়ামি ছাড়িয়া দিলে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। জ্যোতির্ম্ময় বলিলে আমাদের মনে জ্যোতির ভাব আসে, জ্যোতিঃ সাকার জড় পদার্থ। আমরা সূর্য্যের রশ্মি হইতে জ্যোতির ধারণা শিখিয়াছি। আমি না হয় তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় বলার কালে অনেকগুলি সূর্য্যের কল্পনা করিয়া তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় বলিলাম কিন্তু জড়ের হাত এড়াইতে পারিলাম কৈ? আর জ্যোতির্ম্ময় বলিলে এ স্থলেও আধারের জ্ঞান অর্থাৎ জ্যোতির্যুক্ত পুরুষের চিত্র মনে উদিত হইবে। বিরাট্ ও বিভু ইত্যাদি সম্বন্ধেও একই কথা। বিরাটের ধারণা আমরা আকাশ হইতে শিখিয়াছি। আমি না হয় দৃশ্যমান আকাশ অপেক্ষা যতদূর কল্পনা যায় তত বৃহৎ একটী আকাশ ভাবিলাম কিন্তু

সেই চিন্তাও সাকার ও সীমাবদ্ধ হইবে। অনন্ত চিন্তা করিবার আমাদের শক্তি নাই; আমাদের মন যতটুকু আয়ত্ত করিতে পারে তাহাই মাত্র চিন্তা করিয়া থাকি। মুখে যে যাহা বলুন, চিন্তা সকলেই এ ভাবে করিয়া থাকেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রচারক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাকার রূপ অবশ্য মানিতেন না; তিনি এক স্থানে তাঁহার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "নিরাকারের জ্ঞান, অভাবাত্মক জ্ঞান (negative idea) নিশ্চয়ই আছে। সাকারের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নিরাকারের অভাবাত্মক জ্ঞান রহিয়াছে। নিরাকার কি না যাহা সাকার নহে। সুতরাং যাহারা মনে করেন যে আমরা নিরাকার ভাবি, তাহাদের বিষম ভ্রম। নিরাকার আবার ভাবিব কি? আকার নাই আকার নাই এই কি একটা ভাবিবার বিষয়?"

আমরাও তাহাই বলি যে নিরাকার ভাবিবার জিনিষ নহে; চক্ষু মুদিলেই যে নিরাকার চিন্তা হয় ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক কথা। সকলেই সাকার মূর্ত্তি চিন্তা করেন তবে আমাদের সহিত পার্থক্য এই যে আমরা শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট রূপের চিন্তা করি, আর যাঁহারা মুখে বলেন নিরাকার চিন্তা করি, তাঁহারা শাস্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার যেরূপ ধারণা তদ্রূপ মনের কল্পিত মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া থাকেন। সম্প্রদায় বিশেষ মুখে নিরাকার বলিয়া সিংহাসন প্রভৃতির কল্পনা করিয়া সিংহাসনে বসাইয়া থাকেন; এ যে কিরূপ নিরাকার চিন্তা তাহা জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর। যিনি পরিমিত স্থানে সিংহাসনে বসিলেন তিনি পরিমিত স্থানব্যাপী হইলেন, অথচ তিনি নিরাকার ও অমূর্ত্ত এ প্রহেলিকা বুঝিনা। ইহা সোনার পাথরের বাটীর ন্যায় অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র।

আর একটী কথা ; যাঁহারা মূর্ত্তি চিন্তার বিরোধী তাঁহারা ধ্যান ধারণা কিরূপে করিবেন? পাতঞ্জল দর্শনে ধ্যানের এরূপ ব্যাখ্যা আছে, "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্" (পাত। সূ ২) অর্থাৎ হৃদয়াদি কোন প্রদেশে কেবল একটী বিষয় নিশ্চল ভাবে চিন্তা করার নাম ধ্যান। যিনি ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধ্যান করিবেন তাঁহার কোন মূর্ত্তি চিন্তা না করিয়া উপায় কি? বস্তু বিশেষকে নিশ্চল ভাবে মানসিক লক্ষ্য করার নামই ধ্যান। যে বস্তুর চিন্তা করিবেন সেই বস্তু যদি মনের গ্রাহ্য (tangible) না হয় তাহা হইলে মনকে সেখানে নিবদ্ধ করিবেন কিরূপে? আর সেরূপ করিতে হইলেই আকার আসিয়া পড়িবে। আমার হৃদয়ে উপাস্য দেবকে চিন্তা করিতে হইলে আমার হৃদয়ে যতটুকু স্থান তাঁহাকে ততটুকু সীমাবদ্ধ করিতেই হইবে কাজেই তিনি আকারবান্ হইয়া পড়িবেন। বাহিরের মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিলেই নিরাকার উপাসনা হয় না ; যতদিন মন হইতে মূর্ত্তি দূর করিতে পারা না যায় ততদিন সকলেই সাকার সাধক। কেবল বাহিরের মূর্ত্তি ভাঙ্গিলে চলিবে না, মনের মূর্ত্তিও ভাঙ্গিতে হইবে, তবে সাকারের হাত এড়াইতে পারিবে।

বিরুদ্ধবাদিগণ বলিয়া থাকেন "সাকারবাদীর অবলম্বন একটী ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি, নিরাকারবাদীর অবলম্বন অখিল ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ।" সাকারবাদিগণ কেহই প্রতিমাতে তাঁহাদের নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে আবদ্ধ রাখেন না। মার প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা বলেন—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ চণ্ডী।

যিনি সমস্ত প্রাণীতে চৈতন্যরূপে বিদ্যমানা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।

ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥ চণ্ডী।

যিনি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁহার অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয় সমূহ আপন ব্যাপারে প্রকাশমান হয়, যিনি ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যিনি সমস্ত প্রাণীতে সূত্রমণির ন্যায় অনুস্যূত ভাবে বিদ্যমানা রহিয়াছেন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (৺ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীর চণ্ডীর অনুবাদ)। শিবলিঙ্গ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা চিন্তা করেন—

"বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং।"—বিশ্বের আদি ও বিশ্বের বীজ।

শালগ্রাম শিলা সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান করেন—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রপাণিঃ সহস্রপাৎ।"

তাঁহার সহস্র শির, সহস্র হস্ত, সহস্র পাদ ইত্যাদি। কোন হিন্দুই এরূপ বিশ্বাস করেন না যে তাঁহার ইষ্টদেবতা কেবলমাত্র প্রতিমূর্ত্তিতে নিবদ্ধ আছেন। তিনি জানেন তাঁহার ইষ্টদেবতা সমস্ত স্থানে বিরাজিত, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন স্থান নাই যেখানে তাঁহার অভাব আছে।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। গীতা ১৩।১৫

তিনি চরাচর ভূতের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থিত। তবে প্রতিমূর্ত্তি রূপচিন্তা করার প্রকৃষ্ট আধার বলিয়া, হিন্দু তাহাতেই অধিষ্ঠিত ভাবিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ যেরূপ সর্ব্বত্র জলে, স্থলে, বৃক্ষে, পাহাড়ে, ঘটে, পটে, গ্রহে, নক্ষত্রে তাঁহাকে দেখিতে এবং তাঁহার বিদ্যমানতা ও সর্ব্বব্যাপিত্ব উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছেন তেমন আর কোন জাতি শিখেন নাই। "নিরাকার বাদীর অবলম্বন নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ" এটা তাঁহাদের মুখের কথা বটে, কিন্তু অন্তরের কথা নহে। ইহাই যদি তাঁহাদের সত্য বিশ্বাস হইবে, তাহা হইলে হিন্দুর ন্যায় প্রতিমা প্রভৃতিতে তাঁহারা প্রণিপাত করেন না কেন?

ঐ সকল স্থানে কি তাঁহাদের নিরাকার ব্রহ্মের অভাব আছে? হিন্দুর ন্যায় সর্ব্বজনীন ভাবে তাঁহাকে কে দেখিতে, কে পূজা করিতে শিখিয়াছে? হিন্দু যেখানে তাঁহার বিভূতির কিঞ্চিন্মাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন সেখানেই তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

নিরাকার বাদিগণ "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" এই শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে তোমাদের বেদই যখন বলিয়াছেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নাই, তখন তোমাদের এ সকল মূর্ত্তি মিথ্যা ও অমূলক। অবশ্য নির্গুণ ব্রহ্মের কোন মূর্ত্তি থাকা কোন হিন্দুই বলেন না। বেদ যদি নির্গুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া এ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ভাষ্যে প্রতিমা শব্দের এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—"তস্য তস্যৈব ঈশ্বরস্য অখণ্ডসুখানুভবত্বাৎ এতাদৃশদ্বিতীয়াভাবাৎ প্রতিমা উপমা নাস্তি।" এই শ্রুতির অর্থ, ঈশ্বরের সদৃশ আর কেহ নাই তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই সেজন্য তাঁহাকে কাহারও সহিত উপমা (তুলনা) করা যাইতে পারে না। তাঁহারা আর কয়েকটী শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের সাকারত্বের প্রতিকূলে তর্ক উপস্থিত করিয়া থাকেন। এখানে তন্মধ্যে কয়েকটীর আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

(১) মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাঞ্চেন্ মোক্ষসাধিনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানোমানবস্তদা॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

মনের কল্পিত মূর্ত্তি দ্বারা যদি লোক মুক্তি লাভ করিতে পারে তাহা হইলে স্বপ্নে রাজ্য পাইয়া লোক রাজা হইতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, মনের কল্পিত মূর্ত্তির কে চিন্তা করে? হিন্দুগণ নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি ভিন্ন নিজের মন গড়া মূর্ত্তি চিন্তা করেন না। যাঁহারা

ঈশ্বরের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আকারকে অবহেলা করিয়া "নিরাকার" ভাবে চিন্তা করিতে যান, তাঁহারাই নিজ নিজ মনে আকার কল্পিত করিয়া লন। কারণ দয়াময় প্রেমময় ইত্যাদি বলিয়া ডাকিলে একটা কোন না কোন আকার যে মনের মধ্যে আপনা হইতেই আসিবে, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। কাজেই "মনসা কল্পিতা" মূর্ত্তির অভিযোগটা আমাদের প্রতি বর্ত্তিতে পারে না।

(২) মৃৎশিলা ধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥

এখানে মৃৎশিলা ধাতু কাষ্ঠাদির মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বোধে পূজার নিন্দা করা হইয়াছে। কোন হিন্দুই সেই ধাতু কি পাষাণখণ্ড প্রভৃতিকে ঈশ্বর বোধে পূজা করেন না। তিনি জানেন তাঁহার পূজিত দেবতা সর্ব্বস্থানে, সর্ব্ব ঘটে বিদ্যমান আছেন, মূর্ত্তিতেও তিনি বিদ্যমান আছেন; এই জ্ঞানে সম্মুখস্থিত মূর্ত্তিতে ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া থাকেন। পাছে কেহ মৃৎশিলা ধাতু ইত্যাদিতে দেবতা নিবদ্ধ আছেন এরূপ জ্ঞান করেন, এই জন্য এই শ্লোকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন মাত্র। এই শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ হইতে উদ্ধৃত। ঐ স্কন্ধের ২৯ অধ্যায় পাঠ করিলে প্রতিমা পূজা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহার উপলব্ধি হইবে। ঈশ্বরের যে রূপ নাই তাহা ভাগবতকার কোন স্থানে বলেন নাই। তাঁহার সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান সাধক যাহাতে ভুলিয়া না যান এই জন্য এইরূপ বলিয়াছেন।

(৩) অগ্নৌ তিষ্ঠতি বিপ্রাণাং হৃদি দেবো মনীষিণাং।
প্রতিমা স্বল্প বুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র বিদিতাত্মনাম্॥

ব্রাহ্মণদিগের দেবতা অগ্নিতে, মনীষিগণের দেবতা হৃদয়ে, অল্পবুদ্ধিদিগের দেবতা প্রতিমাতে, এবং যাঁহারা আত্মজ্ঞানী, তাঁহাদের দেবতা সর্ব্বত্র।

এখানেও প্রতিমা পূজা নিষেধ করেন নাই; বলিয়াছেন অল্প বুদ্ধি লোকেরা দেবতাকে প্রতিমাতে আবদ্ধ রাখে অর্থাৎ প্রতিমা ভিন্ন অন্য স্থানে তাঁহার অধিষ্ঠান জানে না। অবশ্য যাহারা মনে করে যে কেবল প্রতিমাতেই দেবতা আছেন, অন্য স্থানে নাই, তাহারা যে স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? বস্তুতঃ কোন হিন্দুই এরূপ মনে করেন না। হিন্দু জানেন "যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে"; এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার কুত্রাপি অভাব নাই। হিন্দুর এই শিক্ষা যিনি ভুলিয়া গিয়াছেন তাহাকে এই শ্লোকে লক্ষ্য করিয়া অল্পবুদ্ধি বলা হইয়াছে।

(৪) আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি।

হে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে।

এই শ্রুতি অবলম্বনে কেহ কেহ বলেন নিরাকার ব্রহ্মকে দেখা যায়, শুনা যায়, মনন করা যায়, ধ্যান করা যায়। প্রকৃতপক্ষে এইটী ঈশ্বর উপাসনা বিষয়ক শ্রুতি নহে। এখানে অধ্যাত্মযোগের কথা বলা হইয়াছে; এই অধ্যাত্মযোগের অধিকারী কে তাহা বিস্তার ভাবে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। যাহার বিষয় বাসনার লেশমাত্র আছে তাহার অধ্যাত্মযোগের পথ অবলম্বনীয় নহে।

বাহিরের মূর্ত্তির আবশ্যকতা।

আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের ঈশ্বর চিন্তা সাকার। আকার ভিন্ন আমাদের আর কিছু বুঝিবার ধরিবার কি চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই। মানুষের মন সাকার সুতরাং মন যাহা কিছু চিন্তা করে তাহা সমস্তই সাকার। আমরা আরও দেখিয়াছি যে ঈশ্বরের কালী কৃষ্ণ ইত্যাদি যে সকল রূপের চিন্তা করি তাহা সমস্তই সত্য—আমাদের মনঃ কল্পিত নহে। বাহিরে তাঁহার মূর্ত্তি গড়িবার আবশ্যকতা কি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শাস্ত্র বলিতেছেন -

অর্চ্চকস্ত তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতি শায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্য মৃচ্ছতি॥

যে পূজাতে অর্চকের তপস্যা যোগ থাকে এবং অর্চ্চনাটিও অতিশয়িত রূপে হয় আর প্রতিমাখানিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্থাৎ দেবভাবের প্রকাশক হয়, সেই পূজাতে দেবতার সান্নিধ্য হইয়া থাকে। দেবতার সান্নিধ্য সর্ব্বত্রই আছে সত্য, কারণ তিনি "অন্তিকাত্ অন্তিকে" নিকট হইতেও নিকটে: তথাপি আমাদের ন্যায় বিষয়াসক্ত মানবের নিকট "দূরাত্ সুদূরে" দূর হইতেও অতি দূরে। তাৎপর্য্য এই, তাঁহার ভাবে বিভোর হইতে পারিলে সাধকের দেবতার সান্নিধ্য উপলব্ধি হইয়া থাকে। মূর্ত্তি খানি সুন্দর ও দেব ভাব অর্থাৎ সাত্বিক ভাব প্রকাশক হইলে সাধকের ভাবের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিবে। ভাব না হইলে সমস্তই নিষ্ফল তাই শাস্ত্র বলিতেছেন "ন ভাবেন বিনা সিদ্ধিস্তস্মাদ্ ভাবোহি কারণম্"। তাঁহার প্রতি চিত্তের প্রগাঢ় অনুরাগ না হইলে সিদ্ধি হইতে পারে না; সে জন্য ভাবকে একমাত্র কারণ বলিয়াছেন। মূর্ত্তিখানি যেরূপ হইবে ভাবও তদনুযায়ী হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কুৎসিত

চিত্র সম্মুখে রাখিলে কুৎসিত ভাবের উদয় হইবে এবং কোন সিদ্ধ সাধকের চিত্র সম্মুখে রাখিলে পবিত্র ও নির্ম্মল ভাবের উদয় হইবে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ কথা।

জগৎ পিতা বা জগন্মাতার উপাসনা করিতে হইলে তাঁহার মূর্ত্তি সুস্পষ্ট ভাবে মনে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ না হইলে তাঁহার ধ্যান ধারণা হইবে না এবং তাঁহার প্রতি প্রেমানন্দও জন্মিবে না। মানসিক দর্শনের সাহায্যের নিমিত্ত বাহিরের প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে রাখা আবশ্যক। মনের চিন্তা বাহিরের মূর্ত্তি দর্শন ভিন্ন হইতে পারে না। যিনি কখনও বাহিরের প্রতিমূর্ত্তি দেখেন নাই, তিনি কি দেখিয়া কেমন করিয়া তাঁহার আকার চিন্তা করিবেন। বাহিরে কোন আকার না দেখিলে মনে মনে তাহার চিন্তা ঠিক মত করা যায় না। বর্ণনা শুনিয়া মনে মনে একটা আকার কল্পনা করা যায় সত্য, কিন্তু তাহাও বাহিরের দর্শনসাপেক্ষ। কোনরূপ বর্ণনা শুনিলে সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ব্ব দৃষ্ট আকার, মনের মধ্যে উদিত হয়। প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মায়ের আকার চিন্তা করিলে, পূর্ব্ব দৃষ্ট প্রতিমার আকার স্মরণ হইয়া মানসপটে তাঁহার আকার উদিত হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে কোন প্রতিমা না দেখিয়া থাকিলে বর্ণনার দ্বারা একটী স্ত্রী কি পুরুষ আকার হইতে তাহার আকার মনে মনে গঠন করিয়া লইতে হইবে। এই দুই উপায় ভিন্ন তাঁহার ধারণা করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বদৃষ্ট কোন প্রতিমা বা মনুষ্যাকৃতি হইতে তাঁহার আকার কল্পনা করা অপেক্ষা সন্নিহিত প্রতিমায় তাঁহার সন্দর্শন করা সহজ ও মানসিক প্রত্যক্ষের বিশেষ সাহায্যকারী। প্রতিমা দর্শনে তাঁহার আকৃতি অতি পরিস্ফুট ভাবে মানস পটে অঙ্কিত হয়। কালী কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে সেই সেই দেবতার রূপ ও আকৃতি মনে উদিত হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে

পারে না। তিনি যদিও সর্ব্বত্র সমভাবে আছেন তথাপি আমরা মনের জড়তা বশতঃ তাঁহাকে দেখিতে পাই না। ঘোর অন্ধকারময় তমোগুণ আমাদের মন ও চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে সুতরাং তিনি সন্নিধানে থাকিলেও আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। এদিকে আবার বাহ্য পদার্থের উপর একটা জড়তাময় স্তর পড়িয়া তাঁহাকে আমাদের নয়ন পট হইতে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; আমাদের মন ও নয়ন এবং বাহ্য বস্তু হইতে এই জড়তা অপসারিত না হইলে তাঁহার রূপ লক্ষিত হইতে পারে না। প্রতিমা দ্বারা তাঁহাকে বাহ্য জগতে দর্শন করার বিশেষ আনুকূল্য হয়। দৃশ্যের জড়তা ও নয়নের অপটুতাদিও প্রতিমা দ্বারা অপনোদিত হয়। দৃশ্য বস্তু আর নয়নের মধ্য ভাগে থাকিয়া চশমা যেমন দর্শনের সাহায্য করে প্রতিমাও তেমন নয়ন ও তাঁহার মধ্যভাগে থাকিয়া তাঁহার রূপাদি প্রকাশ করিয়া দেয়। চশমা দ্বারা কোন বস্তু দেখার সময় আমাদের দৃষ্টি যেমন চশমার প্রতি নিবদ্ধ থাকিলেও আমরা চশমার অনুভব না করিয়া দৃশ্য বস্তুর অনুভব করিয়া থাকি সেইরূপ প্রতিমা দ্বারা জগন্মাতার বা জগৎপিতার দর্শনকালে যদিও প্রতিমাতে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তথাপি আমরা তাঁহার রূপ গুণ মহিমাদিই অনুভব করিয়া থাকি। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে অনেকে কৃষ্ণ বর্ণ পাথরের থালায় জল রাখিয়া সূর্য্য দর্শন করিয়া থাকেন তখনও ঠিক এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। প্রথমে কেবল জল মাত্রই নয়ন গোচর হয়, তৎপর আর একটু আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিলে জলের উপর সূর্য্যের রশ্মিপুঞ্জ ভাসিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ বিবেচনা হয়; ক্রমে সূর্য্যমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু তখনও জল গৌণভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশেষে মন আরও অভিনিবিষ্ট হইলে জল একেবারেই দেখা যাইবে না; তখন কেবলমাত্র নির্ম্মল সূর্য্য-বিম্বই দৃষ্টিগোচর হইবে।

এইরূপে জলের সহায়তায় সূর্য্য-বিম্ব দেখার ন্যায় মূর্ত্তির সাহায্যে আমরা তাঁহার অলৌকিক রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইহা কোন রূপকের কথা নহে; ইচ্ছা থাকিলে সকলেই একটু ভক্তি ও আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রতিমাতে মন অভিনিবিষ্ট করিলে, একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাঁহার রূপ সন্দর্শন করার পক্ষে প্রতিমা অতি প্রকৃষ্ট আধার। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন সত্য কিন্তু তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি সর্ব্বভূতে দর্শন করা অতি নির্ম্মল চিত্তের আবশ্যক। যে কাল পর্য্যন্ত সেরূপ ক্ষমতা না জন্মিবে, সে কাল পর্য্যন্ত প্রতিমা ও চিত্রাদিতে দেখিবার অভ্যাস করিতেই হইবে। ক্রমে যখন চিত্তের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি প্রসারিত হইবে, তখন প্রতিমা কেন, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত স্থানে সমস্ত ঘটে নিজের ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন;—

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্ব ভূতেষ্ববস্থিতম্॥

প্রতিমাদিতে সেই কাল পর্য্যন্ত আমার অর্চ্চনা করিবে যে কাল পর্য্যন্ত আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারিবে।

ভগবান্ সর্ব্বভূতে আছেন একথা মুখে বলিলে হইবে না, সত্য সত্যই এ ভাব উপলব্ধি করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত ইহা না হইবে তাবৎ পর্য্যন্ত প্রতিমাদি দর্শন স্পর্শন পূজা স্তুতি ও অভিবন্দন আদি করা একান্ত আবশ্যক। তাঁহাকে উপলব্ধি করার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। যখন প্রতিমাদি পাওয়া না যায় এবং ঘট পুষ্প মন্ত্র বা জলে তাঁহার পূজা করিতে হয়, তখন পূর্ব্ব দৃষ্ট মূর্ত্তি হইতে হৃদয় মধ্যে তাঁহার আকার গড়িয়া লইয়া ঐ সকল আধারে ইষ্ট দেবতার পূজা করিতে হইবে; ইহা হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন।

বাহ্য পূজার জন্যও মূর্ত্তির প্রয়োজন। সাধক যখন নানা প্রকার উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার মূর্ত্তি সাধকের সম্মুখে থাকা একান্ত আবশ্যক। উপচার সকলের প্রদান সময়ে তাঁহার বিশেষ বিশেষ অঙ্গের অনুভব বা লক্ষ্য করিতে হইবে। সাধক প্রথমে নিজ হৃৎপদ্মে নিজ ইষ্ট মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া তথায় তাঁহার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করেন। পরে নিশ্বাস যোগে নিজের হৃদয়স্থিত মূর্ত্তি যেন হস্তস্থিত পুষ্পে সংযুক্ত হইল এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই পুষ্প সম্মুখস্থিত প্রতিমাদিতে অর্পণ করেন; তথায় সেই মূর্ত্তির অধিষ্ঠান হইল এরূপ বিবেচনা করিয়া নানা প্রকার উপহার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। কাজেই নিজের হৃদয়স্থিত দেবতাকে বাহ্য পূজার জন্য বাহিরে আনিতে হয়। মূর্ত্তি থাকিলে এ ভাবটা সহজে ধরা যায়; কারণ প্রতিমার প্রতি অঙ্গে ইষ্টদেবতার এক এক অঙ্গের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করা যায়। প্রতিমার চরণ যুগলে মায়ের চরণ কমল, প্রতিমার মুখ মণ্ডলে মায়ের শ্রীমুখ মণ্ডল এই প্রকার প্রতিমার অঙ্গ দ্বারা মায়ের এক এক অঙ্গ প্রকাশিত হয়। তখন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ করিয়া পাদ্য অর্ঘ আচমনীয় প্রভৃতি উপহার গুলি অর্পণ করিয়া ভক্ত মায়ের সেবারূপ পূজা করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন একটী পরমাণু নাই যেখানে মায়ের সমস্ত অবয়ব ও সমস্ত গুণাদি নাই। মা যেরূপ পূর্ণা ও সর্ব্বব্যাপিনী; তাঁহার ঐশ্বর্য্য অবয়বাদিও সেইরূপ সর্ব্বত্র সমভাবে পরিপূরিত ও সর্ব্বব্যাপক। তাঁহার কোন একটী অবয়বেরও অভাব কোন স্থানে থাকিতে পারে না সুতরাং সকল গুলিই সর্ব্বত্র যুগপৎ অবস্থিত আছে। মায়ের কোন অবয়ব বা গুণাদি অন্য অবয়ব ও অন্য গুণাদি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে না কি থাকিতে পারে না; কারণ তাহা হইলে পরিচ্ছিন্নতা ও ক্ষুদ্রতা দোষ আইসে। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

গীতা ১৩অঃ ১৩ শ্লোক।

তাহার সর্ব্বত্র হস্ত, সর্ব্বত্র পদ, সর্ব্বত্র চক্ষু, সর্ব্বত্র মস্তক, সর্ব্বত্র মুখ, সর্ব্বত্র কর্ণ; এই ত্রিভুবনে তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। কাজেই প্রতিমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসদ্ভাব নাই। উপরে যাহা বলা হইল তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত কারণে প্রতিমা ও আলেখ্যাদির প্রয়োজনীয়তা সম্প্রমাণিত হইল।

(১) মানসিক উপলব্ধির জন্য।
(২) বাহ্য পদার্থে তাঁহার রূপ দর্শন জন্য।
(৩) বাহ্য পূজার জন্য।

প্রতিমাদিতে আমরা দেবতার আবাহন কেন করিয়া থাকি তাহা চিন্তনীয়। হিন্দু যখন তাঁহার অভাব কোন স্থানে দেখিতে পান না তখন প্রতিমাদিতে তাঁহার সত্তা অবশ্যই বিদ্যমান আছে। তিনি কোন স্থান হইতে আসেন না এবং কোন স্থানে যানও না, অথচ আমরা তাঁহার আবাহন বিসর্জ্জন করিয়া থাকি। ইহার রহস্য কি? ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন সত্য কিন্তু আমরা কি তাহা ধারণা করিয়া থাকি; আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিনা; মুখে পণ্ডিতের ন্যায় অনেক কথাই বলা যায় কিন্তু সে গুলি উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত ঐ সকল কথা দ্বারা চিত্তের কোন উপকার হয় না। তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব যখন হৃদয়ঙ্গম হইবে তখন আর শত্রু ও মিত্রে, বিষ্ঠা ও চন্দনে ভিন্ন ভাব থাকিবে না। তখন সমস্ত স্থানে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একদিন এরূপ অবস্থা হইয়াছিল এবং তদবধি তাঁহার বাহ্য পূজা বন্ধ হইল। তিনি বলিয়াছিলেন;—"তাঁকে সর্ব্বভূতে দর্শন কর্‌তে লাগ্‌লুম, পূজা উঠে গেল।"

রাম প্রসাদের ন্যায় জ্ঞানী সাধকও একদিন বলিয়াছিলেন ;—"ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি মন তা জাননা।" এভাব আয়ত্ত করা সহজ সাধ্য নহে; এ ভাবের সাধনা চাই। যত দিন পর্য্যন্ত চিত্তের এইরূপ অবস্থা না হইবে তত দিন মুখে যাহাই বলিনা কেন আমাদের সে জ্ঞান হয় নাই এবং সে কাল পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করার জন্য আবাহন বিসর্জ্জন আবশ্যক। তিনি মূর্ত্তিতে থাকিলেও আমরা তাঁহাকে মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য ডাকিয়া থাকি; ইহা কেবল আমাদের অজ্ঞানতা পরিহারের জন্য। তাঁহাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত মুখে বলিলেও হৃদয়ে জানিনা; এজন্য মূর্ত্তিতে যে তিনি আছেন এ জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহাকে বলি "প্রভু এস, তুমি এই মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হও এবং আমি যতক্ষণ পূজা করি ততক্ষণ তুমি অবস্থান কর।" রাজা রামমোহন রায় আমাদের উপাসনা পদ্ধতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"মন একি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার॥
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, 'ইহাগচ্ছ' বল তাঁকে
তুমি বা কে, আন কাকে একি চমৎকার॥"

ইহার উত্তরে সাধক দিগম্বর ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন :—

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার।
আবাহনে বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কার॥
সর্ব্বত্র পূরিত বায়ু, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়
বলি বায়ু আয় আয়, জীবন সঞ্চার॥
জগন্মাতা জগন্ময়ী, যখন কাতর হই
বলি এস ব্রহ্মময়ী করগো নিস্তার॥

ভ্রান্তি কি আমরা ছাড়িতে পারি ? এ সংসারও ভ্রান্তি, কৈ আমরা কি তাহা ছাড়িতে পারিয়াছি ? তিনি বিশ্বব্যাপী সর্ব্বত্র আছেন, তাঁহার 'এখানে ওখানে' নাই, ইহা সর্ব্ববাদী সিদ্ধ ; কিন্তু তাঁহার 'এখানে ওখানে' না থাকিলেও পূর্ণজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকের তাহা আছে। সর্ব্বত্র তিনি আছেন ইহা যদি যথার্থই হৃদয়ের কথা হইত, তাহা হইলে আজ "তুমি আমি" এইরূপ আত্ম পর জ্ঞান থাকিত না। তিনি সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত থাকিলেও আমার ন্যায় বিষয়ীর পক্ষে তাঁহার এ থাকা না থাকা দুইই সমান। "যে বিভু সর্ব্বত্র" যাঁহারা বলেন তাঁহাদের কি সত্য সত্যই সে জ্ঞান আছে ? তাহা হইলে তাঁহারা প্রতিমাদির নিকট নতশির হন না কেন ? এ বিষয়ে হিন্দু অনেকটা অগ্রসর ; তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে হিন্দু যেমন শিখিয়াছে অন্য কোন মতাবলম্বী তেমন শিখে নাই। হিন্দু যেখানে তাঁহার বিভূতি দর্শন করেন সেখানেই তাঁহার পূজা করিতেছেন।

আর একটী কারণেও আবাহনাদির আবশ্যক। প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহনাদি দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিও বুঝিতে পারে, জড়প্রতিমা পূজার বিষয় নহে, প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত দেবতাই উপাস্য। পাছে মূর্খ অজ্ঞ লোকে জড় প্রতিমাকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে এইজন্য ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহনাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আবাহন বিসর্জ্জন সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ১৩০১ সালের বেদব্যাস পত্রিকায় 'আগমনী চিন্তায়' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয়ের উপসংহার করিব।

"মা সর্ব্বব্যাপিনী, সনাতনী এবং সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিতা, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার কোন স্থানে অভাবও নাই, আগমন নির্গমনও নাই, ইহাও নিশ্চিত বিষয়। কিন্তু তথাপি

অর্চ্চনা কালে প্রতিমাদি বিম্বের মধ্যে তাঁহার আবাহন বিসর্জ্জনানুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজন হয়। আবাহনের প্রয়োজন, তাঁহার বর্ত্তমান সত্তারই উপলব্ধি করা। তিনি এই বিম্বাদির অভিন্নভাবে বিরাজ করিতেছেন, ইহা হৃদয়ের বিশ্বাসক্ষেত্রে সুদৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সব্বাত্মার সহিত এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত না হয়, কি, প্রতিবিম্বের প্রতি অঙ্গে মায়ের শ্রী অঙ্গ দৃষ্টিগোচর না হয়, যতক্ষণ ইহার অচেতন ভাব অন্তরাল করিয়া চৈতন্যময়ীর সচেতন ভাব মনের দ্বারা অনুভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিম্ব মধ্যে মায়ের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইতেছে, অথবা সেরূপ বিশ্বাসহইতেছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। এই বিশ্বাস পরিদীপনার নিমিত্তই বিদ্যমানা মাকেও আবাহন করিতে হয়। এবং প্রতিষ্ঠিতা মায়েরও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। আবাহন এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা দ্বারা উল্লিখিতমত বিশ্বাসটী পরিপক্ক হয়।”

হিন্দু কি পৌত্তলিক!

চিরকালই হিন্দুগণ সগুণ ব্রহ্মের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি মৃত্তিকা, ধাতু, পাষাণাদি দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন। এখন কথা উঠিয়াছে, হিন্দুগণ পৌত্তলিক। সাহেব মিশনারিগণ এ দেশে পদার্পণ করিয়াই বলিতে লাগিলেন হিন্দুগণ পৌত্তলিক (idolater); আর অমনি আমরা ‘কাণ চিলে নিয়াছে’ বলিয়া চিলের পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কি করিয়া আসিতেছেন তাহার মর্ম্ম বুঝিবার জন্য কোন চেষ্টা হইল না; আমরা বুঝিলাম

আমাদের মূর্ত্তি পূজাটা বড় দোষের। অনেক লোক পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, নূতন নূতন সম্প্রদায় গঠিত হইল; হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের উপর গালি বর্ষণ হইতে লাগিল। অনেকেই ঘরের ঢেকি হইলেন এবং হিন্দুগণ পুত্তল পূজক ইহা সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। নূতন ধরণের পুস্তক রচিত হইল, পঞ্চম বর্ষীয় বালকেরা পড়িতে লাগিল "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ", "সকলেরই ব্রহ্মোপাসনা করা উচিত।" এরূপ নানা প্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপ পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইল: এবং বালকগণ নিজ নিজ ধর্ম্মে আস্থা শূন্য হইয়া উঠিল। ইহা অতি রঞ্জিত কথা নহে; পাশ্চাত্য ভাবের সংঘর্ষণে সত্য সত্যই সমাজের এইরূপ ভীষণতর অবস্থা ঘটিয়াছিল।

আমরা কি বাস্তবিকই পুত্তলের উপাসক? কথাটা একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলেই বুঝা যায় যে আমাদের প্রতি এ অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই। হিন্দুগণ কেহই পুত্তল পূজা করেন নাই; অতি অজ্ঞ নিরেট মূর্খ লোকও জানে যে কুম্ভকারের নির্ম্মিত খড় ও মৃত্তিকাময় মূর্ত্তি দেবতা নহে। মূর্ত্তির আবাহন ও প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই প্রণাম করে না। অবশ্য জ্ঞানীর কথা, যিনি সমস্ত জগৎময় ব্রহ্ম দেখেন তাঁহার কথা, স্বতন্ত্র; তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে এক ব্রহ্ম পদার্থ ভিন্ন আর কোন বস্তুর সত্তা দেখিতে পান না। কি জন্য আমরা মূর্ত্তি স্থাপন করি, কি ভাবে মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকি, তাহা বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের নিজ নিজ হৃদয়স্থ দেবতাকে মন্ত্রবলে হৃদয় হইতে বাহিরে আনিয়া মৃণ্ময় আদি মূর্ত্তিতে সঞ্চারিত করিয়া পূজা করিয়া থাকি।

গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাদ্ যথা।
এবং সর্ব্বগো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে॥

গাভীর দুগ্ধ তাহার সর্ব্বাঙ্গ জন্যহইলেও স্তনদ্বার হইতে যেমন তাহা লাভ করা করা যায় তদ্রূপ দেবতা বিশ্বব্যাপিনী হইলেও প্রতিমাদিই তাঁহার স্বরূপ সত্তার অনুভূতির প্রকৃষ্ট আধার। তাঁহার স্বেচ্ছা পরিগৃহীত লীলাময়ী মূর্ত্তি অবলম্বন ভিন্ন জীবের যে আর গতি নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তাঁহার সেই অনন্ত গুণময় ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করায় জন্যই মৃণ্ময়াদি মূর্ত্তির আবশ্যক। হিন্দু কখনও পুত্তলকে দেবতা বোধে পূজা করেন না; দেবতার আবির্ভাব জানিয়া পূজা করিয়া থাকেন। আমরা দেশীয় শিক্ষার অভাবে এবং বিদেশীয় শিক্ষার প্রভাবে আমাদের বহুমূল্য সগুণ ব্রহ্মোপাসনাও পৌত্তলিকতা বলিয়া বুঝিয়াছি, ইহা আমাদের দুরদৃষ্ট সন্দেহ নাই। বাস্তবিক হিন্দুগণ পুত্তলকে দেবতা বোধে পূজা করেন না, তাহারা মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বরের পূজা করেন; সুতরাং তাঁহারা পৌত্তলিক (idolater) নহেন।

শাস্ত্র বলেন ঃ—

প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে জিতপ্রাণোথ সাধকঃ।
ঐক্যং সঞ্চিন্তয়েদ্দেব্যা বাহ্যান্তর্ম্মূর্ত্তিযুগ্মযোঃ॥

জিতপ্রাণ সাধক ইষ্ট দেবতাকে ধ্যান বলে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া পরে অন্তরস্থ দেবা মূর্ত্তি এবং বহিঃস্থিত দেবা মূর্ত্তি এই উভয়ের একত্ব চিন্তা করিবেন। অন্তরের মূর্ত্তিকেই বাহিরের মূর্ত্তিতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, ইহা পুতুল পূজা নহে।

হিন্দু নানা ঈশ্বরের পূজক নহেন।

আমাদের শাস্ত্রে নানা দেব দেবীর কথা আছে; আমরাও নানা প্রকার রূপের উপাসনা করিয়া থাকি। এজন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ আমাদিগকে বহুঈশ্বরসেবক (Polytheist) নাম দিয়াছেন। আমরাও পাশ্চাত্য গুরুদিগের দ্বারা দীক্ষিত হইয়া তাহাই বিশ্বাস করিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে আমরা এক ভিন্ন বহু ঈশ্বর বিশ্বাস করি কিনা তাহা দেখা আবশ্যক।

আর্য্য শাস্ত্রে কুত্রাপি বহু ঈশ্বরের কথা নাই। আপামর সাধারণ সকল লোকেই জানে যে তাহাদের ইষ্ট দেবতা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তিনি নাম ও রূপ ভেদে কখন কালী, কখন শিব, কখন বিষ্ণু, কখন ব্রহ্মা প্রভৃতি আকার ধারণ করেন; এসকল ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে না। তাঁহার যেমন নাম অসংখ্য, তেমনি রূপও অসংখ্য। যাঁহারা বলেন যে বৈদিক সময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে একেশ্বর বাদ প্রচলিত ছিল না, তখন আর্য্যগণ প্রকৃতির এক একটা শক্তিকেই ঈশ্বর বোধে পূজা করিতেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্রে একেশ্বর বাদ রহিয়াছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে আর্য্যঋষিগণের অজ্ঞাত কোন তত্ত্ব আজ পর্য্যন্ত কোন জাতি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। শ্রুতি বলিতেছেন

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণ মগ্নি মাহুরথো দিব্যঃস সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিংযমং মাতরিশ্বান মাহুঃ॥

(ঋগ্ বেদ)

এই আদিত্যকে মেধাবিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি সকলের রক্ষা কর্ত্তা, সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং জ্যোতিঃ স্বরূপ।

ইনি এক হইলেও বহু বলিয়া অভিহিত হন। ইঁহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে। আদিত্য, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি যে অভিন্ন একই ঈশ্বরের নামান্তর মাত্র তাহা এ ঋকে স্পষ্ট বলিতেছেন। আজিও দ্বিজাতিগণ প্রাতঃ, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে যে আদিত্যের উপাসনা করেন তাহাও এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা ভিন্ন আর কিছুই নহে; তাঁহারা সূর্য্যদেবকে ব্রহ্ম জ্ঞানে ও জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা জানিয়া পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দু উপাসকগণ কখনও জড় সূর্য্যপিণ্ডের উপাসনা করেন না; তাঁহারা সূর্য্য মণ্ডলোপহিত চৈতন্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। হিন্দুর সূর্য্যোপাসনা সগুণ ব্রহ্মোপাসনা; কোন দেবতা বিশেষের উপাসনা নহে। সূর্য্যের কয়েকটী মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥

হে বিবস্বন্ তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণুতেজঃ স্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময়, সুতরাং ব্রহ্ম স্বরূপ। তুমি জগৎ সৃজন করিয়াছ, তুমি শুদ্ধ, তুমি সবিতা ও তুমি কর্ম্মফল প্রদান কর। এই মন্ত্রে সূর্য্যকে অর্ঘ দেওয়া হয়।

নমস্ত্রৈলোক্য নাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।
ত্বং জ্যোতিস্ত্বং দ্যুতি র্ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমেব রুদ্রো রুদ্রাত্মা বায়ুরগ্নি স্তমেবচ।

হে ত্রৈলোক্য নাথ তোমাকে নমস্কার; তুমি ভূত সকলের পতি, তুমি জ্যোতিঃ, তুমি দ্যুতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি প্রজাপতি, তুমি রুদ্র ও রুদ্রাত্মা, তুমি বায়ু ও অগ্নি। ইহা সূর্য্যদেবের নমস্কার মন্ত্র।

তাঁহার সত্বার কোন স্থানে অভাব নাই তবে সূর্য্য মণ্ডলে ঐশ্বরিক বিভূতির সমধিক বিকাশ তাই সূর্য্যমণ্ডলোপহিত চৈতন্যের উপাসনা।

আর্য্য হিন্দু অদ্যাপি ও "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ"—সূর্য্য সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের আত্মা—এই মন্ত্র সন্ধ্যোপাসনায় পাঠ করিয়া থাকেন। তিনি একমাত্র সৃষ্টি কর্তা, তিনি মনুষ্য পশু পক্ষীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এই জ্ঞানে আর্য্যগণ সূর্য্য নারায়ণ নামে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহা নানা ঈশ্বরের উপাসনা নহে।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র নামে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন ;—"তিনি ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করিতেছেন। তিনি প্রকুপিত পর্ব্বত সমূহকে নিয়মিত করিয়াছেন। তিনি প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন। তিনি সূর্য্যকে (সূর্য্যের জড় পিণ্ডকে) এবং উষাকে উৎপাদিত করিয়াছেন। দ্যাবা পৃথিবী তাহাকে নমস্কার করে।" সামবেদেও ইন্দ্রকে এই ভাবে বলিয়াছেন,—"শত পৃথিবীর ও শত দ্যুলোকের পরিমাণ করিলেও হে ইন্দ্র! তোমার পরিমাণ হয় না। সহস্র সহস্র সূর্য্যে ও পৃথিবীতে তোমাকে ব্যাপিতে পারে না। পিতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে জ্ঞান দান কর। তোমার অনুকম্পায় জীব তোমার জ্যোতিঃ সমুদ্রে মিশিতে পারে।" এখানেও ইন্দ্র নামে সেই এক পরমেশ্বরকেই আহ্বান করিয়াছেন।

পুরাণে যে কাশ্যপ পত্নী অদিতি হইতে সৃষ্টির বিকাশ বর্ণনা করিয়াছেন সেই অদিতি সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন ;—

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষং অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।

বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনাঃ অদিতির্জাত মদিতির্জনিত্বম্।

অদিতিই আকাশ, অদিতিই অন্তরীক্ষ, অদিতিই মাতা, অদিতিই পিতা, অদিতিই পুত্র, অদিতিই গন্ধর্ব্বাদি লোক সমূহ, অদিতিই জন্ম ও জন্ম কারণ। এই ঋকে সেই সর্ব্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বরই অদিতি নামে অভিহিত।

যজুর্ব্বেদেও সেই এক পরমেশ্বরকে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা, শুক্র, ব্রহ্ম, আপ এবং প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

যথা তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ।

নাম বিভিন্ন হইলেও তিনি এক ও অদ্বিতীয়। কৈবল্যোপনিষদেও তাঁহাকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অক্ষর, ইন্দ্র, কালাগ্নি ও চন্দ্রমা বলিয়াছেন।

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণু স প্রাণঃ স কালাগ্নি স চন্দ্রমাঃ॥

মনুসংহিতায় সেই পরম পুরুষের তত্ত্ব এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন;—"পরমাত্মাই ইন্দ্রাদি সকল দেবতা জানিবে"। "সেই পরম পুরুষকে কেহ অগ্নিরূপে উপাসনা করেন কেহ বা প্রজাপতি মনু বলিয়া উপাসনা করেন, কেহ বা ইন্দ্ররূপে, কেহ প্রাণরূপে অপর কেহ সচ্চিদানন্দস্বরূপ সনাতন ব্রহ্ম স্বরূপে উপাসনা করেন, ব্রহ্ম মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বরূপ হন।"

এখানে সনাতন ব্রহ্ম স্বরূপে যে উপাসনার কথা লিখিয়াছেন তাহা অধ্যাত্ম যোগ। অধ্যাত্ম যোগ কাহাকে বলে এবং অধ্যাত্ম যোগের অধিকারী কে তাহা বিশদ ভাবে আলোচনা করা গিয়াছে।

তন্ত্র শাস্ত্র বলিতেছেন—

যথা দুর্গা তথা বিষ্ণুঃ যথা বিষ্ণু স্তথা শিবঃ।
এতত্রয়মেক মেব ন পৃথগ্ ভাবয়েৎ সুধীঃ॥
যোঽন্যথা ভাবয়েদেতান্ পক্ষপাতেন মূঢ়ধীঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং রৌরবং পাপপূরুষঃ॥

দুর্গা বিষ্ণু ও শিব ইঁহারা সকলেই একবস্তু। সুধী ব্যক্তি পৃথক্ ভাবনা করিবে না। যে মূঢ় পক্ষপাত দোষে দূষিত হইয়া এই দেবতা ত্রয়ের

মধ্যে একতমকে উৎকৃষ্ট এবং অন্যতমকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করে সেই পুরুষ পাপ বশতঃ রৌরব নামক ঘোর নরকে গমন করে।

সৌরাশ্চ শৈবাগাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
মামেব তে প্রপদ্যন্তে বর্ষাম্ভঃ সাগরং যথা ॥
একোঽহং পঞ্চধা ভিন্নঃ ক্রীড়ার্থং ভুবনে কিল। (পদ্ম পুরাণ)

সৌর শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত গণ, যেমন নদী সকল সাগর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি ক্রীড়ার জন্য এক হইয়াও পাঁচ হইয়াছি।

মহাকালী মহাকালশ্চণকাকার রূপতঃ।
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং তন্মধ্যে সমভাগতঃ।
মহারুদ্রঃ স এবাত্মা মহাবিষ্ণুঃ স এবহি।
মহাব্রহ্মা স এবাত্মা নামমাত্রবিভেদকঃ ॥
একমূর্ত্তিস্ত্রিনামানি ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানাভাবে মনো যস্য তস্য মোক্ষেন বিদ্যতে।

মহাকালী এবং মহাকাল অর্থাৎ মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব শক্তি চণকাকারে (ছোলার আকারে) অবস্থিত; চণকের যেমন উপরি ভাগে আবরণ এবং মধ্যে সম ভাগে পরস্পর সংশ্লিষ্ট পরব্রহ্ম তত্ত্বও তদ্রূপ বহির্ভাগে মায়ার আবরণে আবৃত এবং অভ্যন্তরে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব শক্তিরূপে সমভাগে উভয়ে পরস্পর বিজড়িত। এই মাতৃত্ব পিতৃত্ব শক্তিরূপে পরমাত্মাই মহারুদ্র, মহাবিষ্ণু, মহাব্রহ্মা। এক ব্রহ্ম পদার্থই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামত্রয়ে অভিহিত; কিন্তু এই নানা নামে নানা মূর্ত্তিতে নানা ভাবে যাহার মন ধাবিত হয়, তাহার মুক্তি নাই। ইঁহারা এক পরমাত্মারই বিকাশ।" এইরূপ চিন্তা না করিয়া যিনি পৃথক দৃষ্টিতে দেখেন তিনি ভ্রান্ত এবং শাস্ত্র তাহার মুক্তি নাই এরূপ

র্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রে এরূপ অসংখ্য উপদেশ আছে। শাস্ত্রে । সম্বন্ধে কোন অনৈক্য বা অসঙ্গতি নাই। তবে যে শাস্ত্রে যে রূপের কীর্ত্তন করিয়াছেন সে স্থানে তাঁহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন; দ্দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে অপর রূপ গুলিকে খর্ব্ব করা হইয়াছে। নি বৈষ্ণব, তিনি অন্যরূপগুলি তাহার ইষ্ট দেবের রূপান্তর এরূপ চিন্তা রিবেন। অন্যান্য রূপের উপাসক সম্বন্ধেও একই কথা। এই সকল পের যে পরমার্থতঃ কোন ভেদ নাই তাহা শাস্ত্রে বারংবার কীর্ত্তন রিয়াছেন; বাহুল্যও অনাবশ্যক বোধে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না। াধক সম্প্রদায়ও এই ভাবেই তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন। মাতৃসাধক মপ্রসাদ একদিন গাহিয়াছিলেন—

মন ক'রনা দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবিরে কৈলাসবাসী (বৈকুণ্ঠবাসী)॥
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তল্লাসি।
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিবরাম সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী
ওমা রামরূপে ধর ধনু কালীরূপে করে অসি॥

িনি কালী সাধক ছিলেন কাজেই সমস্তই তাহার এলোকেশীর রূপান্তর ভাবে দেখিতেন।

সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রাজ নারায়ণ বসু মহোদয় বলিয়াছিলেন;— "বেদ তি, পুরাণ, তন্ত্র সকল হিন্দু শাস্ত্রেই সেই একমাত্র পরমব্রহ্মকে কীর্ত্তন রিতেছে। সকল সাধারণ হিন্দু অবিশুদ্ধ সংস্কৃতে বলিয়া থাকে "এক হ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।" ব্রহ্মই সকল হিন্দুর উপাসিত দেবতা।" শাস্ত্রের ইহাই থার্থ মর্ম্ম এবং হিন্দুগণ তাহাই করেন। তবে যে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব গাহা অজ্ঞানতা ও ভ্রান্তি প্রসূত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বহুকাল

শাস্ত্রের অনালোচনায় ফলে এরূপ বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মিয়াছে কিন্তু যাঁহার প্রকৃত সাধক তাহারা এরূপ ভেদ বুদ্ধিতে কখনও দেখেন না। একজন বৈষ্ণব সাধকের একটী গাথা উদ্ধৃত করিলাম।

কে জানে তোমার মায়া ওহে শ্রীহরি।
পুরুষ প্রকৃতি হও কভু ত্রিপুরারি।
কভু ব্যাঘ্র চর্ম্ম পর, কভু বা মুরলী ধর,
কভু হও নরহরি রণস্থলে দিগম্বরী।

*   *   *   *   *

জয় বলে রাম রাম, আকার ভেদ, ভেদ নাম।
যেই শ্যামা সেই শ্যাম, ভাব মন ঐক্য করি॥

যাহারা ভেদ বুদ্ধি সম্পন্ন তাহাদের জন্য শাস্ত্র যে নরক ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবান্ হরগৌরী, হরিহর ইত্যাদি রূপে এই সত্য সাধককে দেখাইতেছেন। যেরূপ নাট্যাভিনয়ে একই ব্যক্তি নানারূপ সাজিয়া থাকে, তিনিও নানা ভাবে নানারূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তের সহিত প্রভেদ এই, যখন এক ব্যক্তি রাম সাজে তখন যুগপৎ লক্ষ্মণ সাজিতে পারেন না; কিন্তু যিনি অনন্ত শক্তি সম্প তিনি একই সময়ে যুগপৎ নানা মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিতেছেন। অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত রূপ, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? তিনি কোথায় কি ভাবে লীলা করিতেছেন তাহা মান বুদ্ধির অগোচর। তাঁহার অনন্ত শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দে ভাগবত বলিতেছেন—

সংখ্যা চেদ্রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন
ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে
প্রতি বিশ্বেষু সন্ত্যেব ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ।

বরং ধূলি কণার সংখ্যা করা যাইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা কখনও করা যায় না ; সেইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির সংখ্যা করা যায় না। প্রতি বিশ্বে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি রাহিয়াছেন। তাৎপর্য্যার্থ এই, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় শক্তি অনন্ত ভাবে প্রকাশিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বাস্তব পক্ষে মূলে একই শক্তি, নানাভাবে প্রকাশিত। তাঁহার অনন্তরূপ অনন্ত ভাবে বিরাজিত। এই অনন্ত ক বুঝাইতে গিয়া শাস্ত্র তেত্রিশ কোটি বলিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে জে অনন্ত, রূপও অনন্ত। আমরা সেই অনন্তের চরণে ভক্তিভরে ণপাত করিতেছি।

গণেশো গানপত্যানাং সৌরাণাংস্বংহি ভাস্করঃ।
শাক্তানাং শাক্তরাত্মাচ শৈবানাঞ্চ সদাশিবঃ ॥
বৈষ্ণবাণাং মহা বস্থ রাত্মরূপোহসি যোগিনাম।
জ্ঞানিনাং সর্ব্বরূপস্থং ত্বা নমামি জগৎপতে॥

প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ।